Contents

Dr. Zakir Naik RochonaSomogro -1

Proshnottor Porbo

Bishoy Vittik Proshner Jobab

www.banglainternet.com

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের জবাব

Subjective Question And Answers

banglainternet.com

Contents

সূচিপত্র

সালাত

- স্থানীয় ভাষা সবার বোধগম্য নয়–৬০৩
- কাবা দিক-নির্দেশনা মাত্র–৬০৪
- সালাতের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি–৬০৫
- নিজেদের উপকারের জন্যই ইবাদত–৬০৬
- নামায আদায়ের সুযোগ করতে হবে–৬০৮
- মসজিদে সালাত আদায়ে বাধা নেই–৬১০
- নবুওয়াত লাভের পর সালাতের নির্দেশ–৬১২
- খুব বেশী আলাদা নয়–৬১২
- উত্তর না দেওয়াও উত্তর–৬১৩
- মূল অংশ আরবিতে আবশ্যিক–৬১৬
- মদীনায় আযানের প্রচলন হয়–৬১৭
- সালাতের মূল নিয়ম অভিন্ন–৬১৮
- অলৌকিকত্ব ও চ্যালেঞ্জের প্রতীক–৬১৯
- সালাত ৫ ওয়াক্তই ফরয–৬২১
- নিজের মতো প্রার্থনা করা যায় না–৬২২
- ফরয ও তুলনা এক নয়–৬২৩
- নামাযে টুপি পরা ভালো–৬২৪
- সালাত মুসলিমকেই আদায় করতে হয়–৬২৫
- সালাতের পরিবেশ থাকতে হবে–৬২৬
- পোশাকে ফরয শর্ত পূরণ জরুরি–৬২৬
- প্রার্থনার মূল লক্ষ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টি–৬২৭
- পদ্ধতি এক, ব্যবস্থা আলাদা–৬২৮
- মসজিদের নামাযেই বেশি সওয়াব–৬২৮

ইসলামিক লেবেল

- ঝুঁকি থাকলে লেবেল অপরিহার্য নয়–৬২৯
- জবাবে 'ওয়ালাইকুম' বলা যাবে–৬৩০
- টাই পরা নাজায়েয নয়–৬৩২
- লেবেলের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে–৬৩৩
- দাওয়াত দিতে হবে হিকমতের সাথে–৬৩৪
- যে কোনো দুর্ঘটনায় এ দোয়া পড়া যায়–৬৩৫
- ব্যক্তির উদ্দেশ্য দিয়ে বস্তুর বিচার ঠিক নয়–৬৩৫
- ধূমপান ও তামাকযুক্ত পান অনুমোদিত নয়–৬৩৭
- দাড়ি রাখুন গোঁফ ছাটুন–৬৩৮
- সীমার মধ্যে বাধা করা যাবে–৬৩৮
- দাড়ি-টুপি ইনফেকশনের ঝুঁকি কমায়–৬৩৯
- হাদীসের আলোকে অত্যাবশ্যক–৬৪০
- নামের শিরকের উপাদান বদলানো আবশ্যক–৬৪০

মিডিয়া ও ইসলাম

- ঈশ্বর ইর্ষান্বিত হয় না–৬৪১
- মানুষ মুসলিম হয়ে জন্ম নেয়–৬৪২
- প্রকৃত মুসলিম ভুল কাজ করে না–৬৪৩
- খৎনা রোগ-বালাই প্রতিরোধক–৬৪৪
- জ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে–৬৪৫
- টেররিজম-জিহাদ নিয়ে অপপ্রচার–৬৪৮
- সিনেমার মাধ্যমেও ধর্মপ্রচার সম্ভব–৬৫২
- ধর্মপ্রচারে মিডিয়ায় সম্পদ ব্যয়–৬৫৪
- শরিয়াহ মেনেই টিভি চ্যানেল চালাতে হবে–৬৫৫
- ভ্রূণতত্ত্বে একাধিক শব্দের অর্থ–৬৫৬
- শরিয়াহ স্বীকৃত জিহাদের সীমারেখা–৬৫৮
- ইসলামে আত্মহত্যা হারাম–৬৬০
- আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেনি–৬৬১
- ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে ইসলাম আক্রমণ–৬৬২
- মিডিয়ায় মহিলা প্রসঙ্গ মতভেদ–৬৬৩
- মিডিয়ার অপপ্রচারের সঠিক জবাব–৬৬৪
- মিডিয়ায় ইসলামকে হেয় করা–৬৬৫
- আন্তর্জাতিক ভাষায় টিভি চ্যানেল দরকার–৬৬৭

banglainternet.com

Contents

- ইসলামী ভাবধারায় শিশুদের অনুষ্ঠান–৬৬৮
- ধর্ম সবসময় উপরে থাকে–৬৬৯
- ইসলামী পদ্ধতিতে মিডিয়া ব্যবহার–৬৭০
- অন্যান্য ধর্মগ্রন্থও পড়তে হবে–৬৭১
- টিভি চ্যানেলে ব্যয় করুন–৬৭৩
- মুসলিম মিডিয়াও বিভ্রান্ত হয়–৬৭৫
- মিডিয়া-দাজ্জালকে মুসলিম বানান–৬৭৫

ইসলামে নারী অধিকার

- পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই নবীর উপযুক্ত–৬৭৭
- মহিলাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তার স্বার্থে–৬৭৯
- দত্তক নেয়া বৈধ নয়–৬৭৯
- বিশেষ কিছু' বা 'সাথী' (হুর) পাবে–৬৮০
- সকল ক্ষেত্রে একথা ঠিক নয়–৬৮১
- বহু বিবাহের অনুমতি শর্তসাপেক্ষ –৬৮২
- নৈতিক ও সামাজিক কারণে অনুমোদনযোগ্য–৬৮৫
- স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে পারেন না–৬৮৬
- ইজ্জত-আব্রু হিফাজত করতে–৬৮৭
- জন্ম ও বংশ পরিচিতি অক্ষুণ্ন রাখতে–৬৯০
- মেয়েরা উইল করতে পাবে–৬৯১
- সৃষ্টি-প্রকৃতি মেয়েদের অনুকূল নয়–৬৯১
- অবশ্যই নিরাপদে থাকবে–৬৯২
- তত্ত্বকথা অনুযায়ী অনুশীলন উত্তম–৬৯৩
- স্বজন ও সমাজ দায়িত্ব নেবে–৬৯৪
- ন্যায়সঙ্গত অংশীদার করা হয়েছে–৬৯৪
- এটি ভারসাম্যপূর্ণ আধুনিক ব্যবস্থা–৬৯৬
- শালীনতার প্রশ্নে সঙ্গত নয়–৬৯৭
- ইসলাম সহশিক্ষার অনুমতি দেয়নি–৬৯৮
- নারী আলেম তৈরি হচ্ছে–৬৯৯
- ইসলামে ডিভোর্সের প্রকারভেদ আছে–৭০০
- মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ নেই–৭০১
- স্ত্রীর অনুমতি নেয়া উত্তম–৭০২
- যুদ্ধের প্রয়োজনে ছাড় দেয়া হয়েছে–৭০৩
- বাধা নয় পরামর্শ দিতে পারবে–৭০৩
- একমাত্র পিতাই অভিভাবক নয়–৭০৪

banglainternet.com

প্রসঙ্গ কথা

ইসলামে ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। সালাতের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে মুসলিম অমুসলিম অনেকের মনেই রয়েছে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। একই কথা ইসলামি লেবেল তথা পরিচ্ছেদের ব্যাপারেও। নারী অধিকার এবং মিডিয়া ও ইসলাম প্রসঙ্গত রীতিমতো প্রাত্যাহিক বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এগুলোর ওপর সুচিন্তিত প্রশ্ন থাকলেও জবাবের বিষয়টি খুব সহজ নয়, কারণ চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। এছাড়াও রয়েছে বাস্তবতা ও যুক্তিকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে মানসিকতার প্রশ্ন। এমনি বহুমুখী প্রশ্নই অনেক সহজ ও স্বাভাবিক বিষয়কে জটিল করে তোলে এবং সৃষ্টি করে মতভিন্নতা। এমনি অবস্থা সত্য ও সুন্দরের আবিষ্কারকসহ তা গ্রহণ ও বর্জনের পরিবেশকেও বিঘ্নিত করে। এজন্য জিজ্ঞাসা যেমন থাকতে হয় তেমনি থাকতে হয় তার সুচিন্তিত ও পরিশীলিত জবাবও। এখানে সালাত, ইসলামিক লেবেল, নারী অধিকার, মিডিয়া ও ইসলাম প্রভৃতি সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের জবাব উপস্থাপন করা হয়েছে যা সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক।

সালাত

প্রশ্ন : আমরা মুসলমানরা কেনো আরবি ভাষায় সালাত আদায় করি যখন আমরা ভাষাটাই বুঝতে পারি না। আমরা যখন সালাত আদায় করি তখন কি স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা যাবে?

স্থানীয় ভাষা সবার বোধগম্য নয়

উত্তর : প্রশ্ন হচ্ছে– বেশিরভাগ মুসলিমই যখন আরবি ভাষা বুঝতে পারে না তাহলে এটা করলে কেমন হয়, যদি আমরা প্রত্যেকেই স্থানীয় ভাষায় সালাত আদায় করি? সেটাই কি ভালো নয়? তর্কের খাতিরে ধরুন আপনার কথাটা মেনে নিলাম অর্থাৎ আমরা স্থানীয় ভাষায় নামায আদায় করতে পারি। আর এমন যদি হয়, তাহলে বোম্বেতে কিছু লোক বলবে, আসুন আমরা ইংরেজিতে পড়ি। কেউ হয়ত বলবে উর্দু, কেউ হয়তো বলবে হিন্দি। কেউবা আবার গুজরাটি। তখন সেখানে দেখা যাবে বিশৃঙ্খলা। এই সমস্যার সমাধান যদি করি তাহলে দেখা যাবে কেউ বলছে, চলুন ১ নম্বর মসজিদে যাই সেখানে আমরা ইংরেজিতে সালাত আদায় করব। ২ নম্বর মসজিদে উর্দুতে। ৩ নম্বর মসজিদে হিন্দিতে। ৪ নম্বর মসজিদে গুজরাটি ভাষায়। আর এভাবেই চলতে থাকবে।

তারপরও সেখানে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা থাকবে। কেউ হয়তো বলবে ১ নম্বর মসজিদে আমরা ইংরেজিতে নামায আদায় করব। আমরা সেখানে আল্লামা ইউসুফ আলীর অনুবাদটা পড়ব। আবার কেউ বলল আমরা পিকথলের অনুবাদটা পড়ব। কেউ হয়ত বলবে মাওলানা আব্দুল মজীদ দরিয়াবাদী, আবার নির্দিষ্ট কেউ হয়ত বলবে মোয়াজ্জেম খান। আবারও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যদি এটাও মেনে নিই যে ঠিক আছে আমরা একটা অনুবাদ পড়ব, তবুও সে অনুবাদটা হবে মানুষের হাতে লেখা। অনুবাদতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কথা অথবা নবীজীর কথাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। এই অনুবাদে অনেক ভুল থাকতে পারে। আর যদি ভুল থাকে তখন বলা হবে– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভুল করেছেন। যেমন ধরুন, আপনি যদি ২ নম্বর মসজিদে সালাত আদায় করেন সেখানে সব উর্দুতে পড়া হয়। আর ইমাম সেখানে সূরা লুকমানের ৩৪ নম্বর আয়াত থেকে তিলাওয়াত করলেন। আপনারা যদি কুরআনের উর্দু অনুবাদ পড়েন, বেশির ভাগ উর্দু অনুবাদে পবিত্র কুরআনের এ-আয়াতর অর্থ লেখা হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ জানে না মায়ের গর্ভে সন্তানের লিঙ্গটা কী?' যদি আরবিতে কুরআন শরীফ পড়েন, তাহলে দেখবেন আরবিতে লিঙ্গ শব্দটি কোথাও নেই। উর্দুতে বেশীর ভাগ অনুবাদক তরজমা করার সময় এভাবে লিখেছেন। আর যদি এভাবে কোনো ডাক্তার

banglainternet.com

সালাত আদায় করেন তা হলে তিনি ভাবতে থাকবেন–এটা কোন ধরনের কথা যে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না মায়ের গর্ভের সন্তানটির লিঙ্গ কী হবে?

এখনকার দিনে আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে আমরা আগের থেকেই জানতে পারি সন্তানের লিঙ্গটি কী হবে। তাই ডাক্তার তখন সন্দেহ করা শুরু করবেন। আর সেজন্য আপনি অনুবাদটা পড়তে পারবেন না। কারণ যদি অনুবাদটা পড়েন, আর সেখানে কোনো ভুল করেন, তখন বলা হবে আল্লাহ তায়ালা ভুল করেছেন, যদি সেটি কুরআনের কোনো আয়াত হয়। আর যদি হাদিস হয় তবে বলা হবে রাসূল (স) ভুল করেছেন। আর আপনি অনুবাদের মধ্যে কখনও পুরো অর্থটা পাবেন না। অনুবাদের সাহায্যে আপনি আংশিকভাবে অর্থটা পাবেন, যেন মনোযোগ দিতে পারেন। যেমন ধরুন, আমি প্রায়ই বিভিন্ন দেশে যাই। আমি যদি ফ্রান্সে যাই, আপনার কথা অনুযায়ী, সেখানে সালাত আদায় করা হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। যদি সালাত আদায় করা হয় ফ্রেঞ্চ ভাষায় তবে সেখানে আযানটাও দেয়া হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। মুয়াযযিন ফ্রেঞ্চ ভাষায় আযান দিলে আমি ভাববো কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে।

আমি যদি মসজিদে যাই, আর সেখানে নামায আদায় করি, সেটা হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। আমি তখন ভাববো, ইমাম সাহেব কি আল্লাহর প্রশংসা করছেন, না কি গল্প বলছেন! সালাত যদি জার্মান বা স্প্যানিশ প্রথা বা অন্য কোনো ভাষায় হয়, আর আমি যদি হই একজন ভারতীয়, যে স্প্যানিশ বা জার্মান ভাষা জানি না, তাহলে বুঝবো না নামাযে কী পড়া হচ্ছে। আমি তার অর্থটাও বুঝব না। আর আরবিতে আযান পৃথিবী জুড়ে সকল মুসলিমের কাছে জাতীয় সঙ্গীত। পুরো পৃথিবীর মুসলিমদের জন্য বোধগম্য বাণী। সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় থাকুক না কেনো সহজেই আযানের অর্থটা বুঝতে পারবে। এটা আমাদের আন্তর্জাতিক সঙ্গীত। সে জন্য সবচেয়ে ভালো উপদেশটা হলো, মুসলিমদের পবিত্র কুরআনের ভাষাটা শিখতে হবে। যদি আমরা কুরআনের আরবিটা নাও বুঝি তাহলে অন্ততপক্ষে অর্থটা বুঝতে হবে। যে ভাষা আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন সে ভাষায় আপনি কুরআনের অনুবাদটা পড়ুন তাহলে আপনি সালাত আদায়ের উপকারিতাগুলো পাবেন।

প্রশ্ন : অনেক মুসলিম বলেন ইসলাম যখন মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে তখন মুসলমানরা কেনো ইবাদতের সময় কাবার সামনে নতজানু হয়?

কাবা দিক-নির্দেশনা মাত্র

উত্তর : ইসলাম যেহেতু মূর্তি পূজার বিরোধী তাহলে কেনো আমরা নামাযের সময় কাবার সামনে মাথা নোয়াই যার অর্থ হচ্ছে আমরাই সবচেয়ে বড় মূর্তি পূজারী। আসলেই কী আমরা মূর্তি পূজারী?

আমরা নামাযের সময় মুসলিমরা মাথা নোয়াই কাবা শরীফের দিকে, কাবা হলো

আমাদের কিবলা, দিকনির্দেশনা। আমরা কিন্তু কা'বার উপাসনা করি না। সালাতের সময় আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করি না। ইসলাম ধর্মে আমরা একথা বিশ্বাস করি। ধরুন এখানে মুসলিমরা সালাত আদায় করবে। কেউ হয়তো বলবে উত্তর দিকে মুখ করে দাড়াই, কেউ বলবে দক্ষিণ দিকে মুখ করে। কেউ বলবে পূর্বদিকে আবার কেউ বলবে পশ্চিম দিকে। তাহলে আমরা কোন্ দিকে ফিরে দাঁড়াব? তাই একতার জন্য এই পৃথিবীর সকল মুসলিম আল্লাহর নির্দেশে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াই।

যদি আপনি থাকেন পশ্চিমে তবে পূর্ব দিকে ফিরে দাঁড়াবেন। যদি থাকেন পূর্বদিকে তবে পশ্চিম দিকে ফিরে দাঁড়াবেন। যদি উত্তরে থাকেন দক্ষিণ দিকে ফিরে দাঁড়াবেন। দক্ষিণে থাকলে উত্তরে ফিরে দাঁড়াবেন।

সব মুসলিম একতার জন্য কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। আর মুসলিমরাই ইতিহাসের প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল।

প্রশ্ন : সালাত আসলে একধরনের জিমন্যাস্টি ছাড়া কিছুই না– অমুসলিমদের এ প্রশ্নের কী জবাব দেবেন?

সালাতের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনাভঙ্গি বলছে 'সালাত' এবং 'জিমন্যাস্টি'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে জিমন্যাস্টির মাধ্যমে যে উপকার রয়েছে নামাযের মাধ্যমেও একই উপকার পাওয়া যায়। জিমন্যাস্টির সময় যেমন ওঠা-বসা করা হয়, নামাযের সময়ও রুকু, সিজদা করা হয়। তাহলে এবার পর্যালোচনা করে দেখা যাক বক্তব্যটি কতটুকু সঠিক।

সালাত এবং জিমন্যাস্টির মধ্যে পার্থক্যটা আসলে বিশাল। নামাযের মাধ্যমে শরীর ও আত্মার উপকার সাধিত হয়। ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনার শরীরের উপকার হবে কিন্তু আত্মার কোনো উপকার হয় না। সালাতে আপনি মানসিকভাবে শান্তি পাবেন, জিমন্যাস্টির মাধ্যমে তা পাবেন না। সালাতে আপনি নড়াচড়া করবেন ধীরে ধীরে, কোনোরূপ ঝাঁকি ছাড়া। পক্ষান্তরে জিমন্যাস্টিতে নড়াচড়া করতে হবে ঝাঁকি দিয়ে। আবার নামাযের পর আপনার অলসতা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু জিমন্যাস্টির পর শরীর অবসন্ন হবে। সালাতের পর আপনার কাজ করতে ইচ্ছে করবে। ব্যায়ামের পর আপনি ক্লান্ত হবেন, কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। সব বয়সের মানুষ সালাত আদায় করতে পারে। অথচ সব বয়সের মানুষ ব্যায়াম করতে পারে না। সালাতে কোনোরকম টাকা লাগবে না, যদি ভালো ব্যায়ামাগারে যান তাহলে টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবেন।

সালাতের জন্য কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, কিন্তু জিমের জন্য প্যারালাল

banglainternet.com

বার, রিং ইত্যাদি যন্ত্রের দরকার হয়। সালাত আদায়ে সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা, সংহতি বৃদ্ধি পায়। জিমের মাধ্যমে সমাজের কোনো উন্নতি হয় না। নামায আদায় আপনাকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে পরিচালিত করে। আপনি হবেন আরও উন্নত মানুষ। জিমের মাধ্যমে আপনি উন্নত মানুষ হবেন না। অথবা এতে আপনার ন্যায় নিষ্ঠার উন্নতি হবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ সালাতের অন্যতম উদ্দেশ্য। সেখানে একটা নিয়ত থাকবে।

বাহ্যিকভাবে সালাত ও জিমন্যাস্টির অঙ্গভঙ্গির মিল থাকলেও দুটো জিনিস এক নয়। কারণ সালাতে আমরা নিয়্যত করি। সালাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে ধন্যবাদ জানাই, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাই। এটা জিমন্যাস্টিতে কখনও পাবেন না।

প্রশ্ন : আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন? এতে তার কী উপকার হবে?

নিজেদের উপকারের জন্যই ইবাদত

উত্তর : প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন আর এটা তার কেনইবা প্রয়োজন, কিংবা এতে তার উপকারটাইবা কী?

আমরা যখন আল্লাহর প্রশংসা করি অথবা কেউ বলল– আল্লাহু আকবার, অর্থাৎ আল্লাহ মহান। এই বলার জন্য কিন্তু আল্লাহ মহান হচ্ছেন না। আল্লাহ এমনিতেই মহান। আপনি ১০ লক্ষ বার আল্লাহু আকবার বলুন বা এক বারই বলুন আল্লাহ তারপরও মহানই থাকবেন। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সবসময় সর্বশক্তিমানই থাকবেন।

আসলে আমরা আল্লাহর উপকারের জন্য তাঁর প্রশংসা করি না। কারণ সূরা 'ফাতির' এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

অর্থ ঃ হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ; তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলে তাতে তাঁর কোনো উপকার হবে না। আমরা যদি তাঁর প্রশংসা করি তাহলে আমাদেরই উপকার হবে। আমাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। আমরা উপদেশ মেনে চলব সেই লোকের যে বুদ্ধিমান, বিখ্যাত, জনপ্রিয় আর জ্ঞানী। আমরা এমন কোনো লোকের নির্দেশ মানব না যে অচেনা, অপরিচিত, বুদ্ধিমান নয় কিংবা জ্ঞানী নয়। সেজন্য আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি আমাদের উপকারের জন্য। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সবচেয়ে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ও সবার উপরে। আর আমরা যেন তার নির্দেশগুলো সবসময় মেনে চলি। আর একারণেই কুরআনের প্রথম সূরা 'ফাতিহা'র ১ থেকে ৪ নং

আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থ ঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থ ঃ যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থ– যিনি বিচার দিনের মালিক।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থ ঃ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

এখানে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করে নিজেদের বুঝাচ্ছি যে তিনিই সর্বশক্তিমান। তিনি হলেন এমন একজন যার কছে আমরা সবরকমের সাহায্য চাই। এরপর আমরা সূরা ফাতিহার অন্য আয়াতগুলো পড়ি– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔
অর্থ ঃ আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔

অর্থ ঃ সে সকল লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

অর্থ ঃ তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি নিজেদের উপকারের জন্য। আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর কাছেই আমরা বিভিন্ন উপদেশ চাইব। শোকে-দুঃখে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য ও উপদেশ চাই। যেমন ধরুন, একজন লোকের হার্টের সমস্যা আছে। সে অসুস্থ। যদি অপরিচিত, অচেনা কোনো মানুষ এসে অসুস্থ লোকটিকে উপদেশ দেন, আপনারা কি তাঁর উপদেশ মেনে চলবেন নাকি যিনি বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ তার কথা মানবেন? কার উপদেশ মানবেন? আপনি এখানে সেই লোকটির উপদেশ মানবেন যিনি একজন হার্ট স্পেশালিষ্ট। যিনি একজন ডাক্তার। আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি। আর তাতে আমাদের উপকার হবে। কিন্তু আমরা আল্লাহ তাআলার যত প্রশংসাই করি না কেন সেটা যথেষ্ট নয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফ এর ১০৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۔

অর্থ ঃ বলুন, যদি সমুদ্রের পানি কালি হয় আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্য, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটা সমুদ্রও যদি এনে দেয়া হয়।

banglainternet.com

একই ধরনের কথা সূরা 'লুকমান'এর ২৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

অর্থ ঃ পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবুও তার বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আপনি যতই প্রশংসা করেন সেটা আসলে যথেষ্ট নয়। তার পরও আমরা আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করি। আমরা মেনে নিই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বজ্ঞ। আমরা সরল পথে থাকার জন্যই তাঁর প্রশংসা করি।

অর্থাৎ আমরা নিজেদের উপকারের জন্যই আল্লাহর প্রশংসা করি।

প্রশ্ন : যদি অফিসের সময়স্বল্পতার কারণে নামায আদায় করতে না পারি তখন আমি কী করব?

নামায আদায়ের সুযোগ করতে হবে

উত্তর : একজন মুসলিম হিসেবে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের জন্য ফরয। ভোর বেলায় ফজর এবং রাতের বেলা এশা এই দুই ওয়াক্তের সাথে অফিস টাইমের কোনো বিরোধ নেই। মাগরিবের সালাতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে যোহরের সালাতের কথা যদি বলেন, এই সালাত আদায় করতে পারেন দুপুরের আহারের সময়। প্রায়ই দেখা যায় অফিসের Lunch time –এর সাথে এটা মিলে যায়।

আপনি এখানে সমস্যায় পড়তে পারেন আসরের ওয়াক্তে। এছাড়া আপনি Night Shift এ চাকরি করলে হয়তো অন্যান্য নামাযে সমস্যা হতে পারে। আর যদি কোনো সমস্যায় পড়েন অর্থাৎ আপনার অফিস সময় সূচির সাথে যদি সালাতের ওয়াক্তের কোনো বিরোধ হয়, আপনি তখন যা করবেন তা হলো– আপনি আপনার বসকে অনুরোধ করবেন যেন আপনাকে সালাত আদায়ের জন্য ১০ মিনিটের ছুটি দেন। তবে বেশীর ভাগ মুসলিম আমরা সালাত আদায়ের জন্য আমাদের বসকে অনুরোধ করতে লজ্জা পাই। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে যেমন পিকনিকের জন্য, বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য, জন্ম দিনের অনুষ্ঠানের জন্য আমরা অনুরোধ করতে পারি। অথচ সালাতের কথা বলতে আমরা লজ্জা বোধ করি।

বেশীর ভাগ মুসলিম এ ব্যাপারে লজ্জা পান। হীনম্মন্যতায় ভোগেন। আপনার বস যদি অমুসলিমও হন, আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে যে, তিনি আপনাকে সালাত

আদায়ের অনুমতি দেবেন। তবে অনুরোধ করবেন ভদ্রভাবে। নম্রভাবে। তিনি তখন আপনাকে অনুমতি দেবেন। কিছু মুসলিম আছেন যারা সালাত আদায়ের জন্য ১ ঘণ্টার বেশী সময় নেন। দেরীর কারণ জানতে চাইলে বলেন দূরে একটা মসজিদে তারা গিয়েছিলেন। এখন বলুন, বস তখন কী চিন্তা করবেন– তিনি ভাবলেন লোকটি কি সালাত আদায় করতে গিয়েছিল নাকি বেড়াতে? আমার কোনো আপত্তি নেই যদি মসজিদে যান এবং মসজিদটা কাছাকাছি হয়। যদি মসজিদটা অফিসের কাছাকাছি না হয়ে দূরে হয় তবে আপনি অফিসে নামায আদায় করুন। আপনি একটা জায়নামায সংগ্রহ করে সেখানেই নামায আদায় করুন। নামায শেষে জায়নামাযটি ড্রয়ারে রেখে দিন।

সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডে "Book of Salaah" -এর ৫৬ তম অধ্যায়ের ৪২৯ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে– 'এই পৃথিবীকে আমার ও আমার অনুসারীদের জন্য বানানো হয়েছে একটা সিজদার স্থান (মসজিদ) হিসেবে।' সেজন্য যখনই সালাত আদায়ের ওয়াক্ত আসবে তখনই সালাত আদায় করবেন। নফল নামায আদায় করার দরকার নেই। অন্তত ফরযটুকু আদায় করুন। পাশাপাশি সুন্নাত নামায আদায় করুন। সেটাই যথেষ্ট। আপনি আরেকটা সমস্যায় পড়তে পারেন। যখন সালাত আদায় করবেন হয়ত দেখলেন আপনার সামনে একটা ছবি আছে। তখন ছবিটা নামিয়ে ফেলুন অথবা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। যদি ছবির কারণে সালাত আদায়ে সমস্যা হয় অন্য রুমে চলে যান।

আর কিছু মানুষ আছে যারা অমুসলিম মানুষের অফিসে জামাতে সালাত আদায় করে। জামাতে সালাত আদায়ে অসুবিধা নেই, তবে খেয়াল রাখবেন যেন সব মুসলিম কর্মচারী একসাথে কাজ বাদ দিয়ে উঠে না যান। এমনটা হলে অফিসের কাজ-কর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য আলাদা জামাতে সালাত আদায় করতে পারেন। সহী বুখারীর ১ম খণ্ডের 'বুক অব আযান' এর ৩৫ তম অধ্যায়ের ৬২৭ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে– 'জামাত দু'জন ব্যক্তি নিয়েও হতে পারে।' তাহলে যদি অমুসলিম মালিকের অফিসে চাকরি করেন কাজ বন্ধ করে সালাত আদায় করবেন না। আলাদা জামাতে সালাত আদায় করুন। যদি একজন লোক, কোনো মুসলিম নিষ্ঠার সাথে কাজ করে, সততার সাথে কাজ করে, কোনো অমুসলিম বসও আপনাকে সালাত আদায়ে বাধা দেবে না। যদি আপনার বস একগুয়ে হয়, আপনি তখন এভাবে বলতে পারেন– ঠিক আছে আমি টি-ব্রেকের সময় বাইরে যাব না, আমাকে সালাত আদায়ের জন্য কিছু সময় দিন। অথবা আপনি এভাবে বলতে পারেন যদি আমাকে ১০ মিনিটের ছুটি দেন, ছুটি শেষ হলেও আমি বিনা পারিশ্রমিকে দ্বিগুণ কাজ করে দেব। এক্ষেত্রে ওভার টাইম পেমেন্ট দেয়ার দরকার নেই। যে কোনো ব্যবসায়ী মেনে নেবেন আপনি যদি ১০ মিনিট ছুটি নিয়ে আধ

banglainternet.com

ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করে দেন। এমনিতে তার দেড়গুণ খরচ হতো। আপনি তাকে বলবেন আমি তিনগুণ কাজ করব আর এজন্য আমাকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি রাজি হয়ে যাবেন।

তবে একেবারে চরম পরিস্থিতিতে যদি আপনার বস ঐ ১% এর ১জন হন, সালাত আদায়ের অনুমতি না দেন তখন আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়টা হলো চাকরিটা বদলানো। কারণ, সালাত আদায় করা ফরয। আপনি হয়ত জানেন না আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনি যে চাকরিটা পাবেন সেখানে আরও বেশী পারিশ্রমিক পেতে পারেন, আবার কমও পেতে পারেন। তবে নতুন চাকরিতে আপনি বেশী বেতন পান বা না পান এজন্য পরকালে অশেষ কল্যাণ রয়েছে। চাকরির কারণে সালাত আদায় না করলে সেই উপকারটি পাবেন না।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম প্রতিষ্ঠান দেখা যায় যেখানে বেশীর ভাগ কর্মচারী মুসলিম কিন্তু সালাত আদায় করে না। একাও করে না জামাতেও করে না। সব মুসলিম ভাইদের আমি অনুরোধ করব, আপনারা আপনাদের অফিসের সকল মুসলিম সদস্যের নামায আদায় নিশ্চিত করুন। আর আপনারা অফিসের কাজের অসুবিধা না হয় এমনভাবে নামায আদায়ের ব্যবস্থা করুন। আপনি যদি কর্মচারীদের নিয়ে সালাত আদায় করেন তাহলে আপনি লাভবান হবেন।

প্রশ্ন : মহিলারা কি মসজিদে সালাত আদায় করতে পারে?

মসজিদে সালাত আদায়ে বাধা নেই

উত্তর : পবিত্র কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে মহিলাদের মসজিদে নামায আদায়কে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়াও এমন কোনো সহীহ হাদীসও নেই যেখানে বলা হচ্ছে যে মহিলারা মসজিদে সালাত আদায় করতে যেতে পারবে না। তবে এমন অনেক সহীহ হাদীস আছে যেগুলো উল্টা কথা বলে। সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডে 'সালাত' অধ্যায়ের ৮৩২ নম্বর হাদীসে উল্লেখ আছে–

'তোমাদের স্ত্রীগণ যারা মসজিদে যেতে চায় তাদেরকে বাধা দিও না।'

সহীহ বুখারীর ৮০ নম্বর অধ্যায়ের ৮২৪ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে– 'যখন রাতের বেলা মসজিদে যেতে চাইবে যেতে দাও।'

লক্ষ্য করুন, আলোচ্য হাদিসটিতে রাতের বেলাও মহিলারা যদি মসজিদে যেতে চায় তাহলেও তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

সহীহ মুসলিমের ১ নম্বর খণ্ডের 'বুক অব সালাত' এর ১৭৫ নম্বর অধ্যায়ের ৮৮১ নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে, 'আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

পুরুষের জন্য শ্রেষ্ঠ সারি হলো সামনের সারি, আর সবচেয়ে খারাপ হলো শেষের সারি। মহিলাদের জন্য শ্রেষ্ঠ সারি হলো শেষের সারি আর সবচেয়ে খারাপ হলো সামনের সারি।' তার মানে পুরুষ এবং মহিলারা মসজিদে একসাথে সালাত আদায় করতে পারবে। আর সালাত আদায়ের সময় পুরুষদের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সারি হলো প্রথম সারি। মাহিলাদের জন্য শ্রেষ্ঠ হলো শেষের সারি। পুরুষের জন্য খারাপ হলো শেষের সারি। মহিলাদের জন্য খারাপ হলো প্রথম সারি।

এরকম অনেক হাদিস আছে যদি আপনি পড়েন তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। সহীহ মুসলিমের প্রথম খণ্ড বুক অব সালাতের ১৮৪ নম্বর হাদিসে আরো বলা হয়েছে– 'তোমরা মসজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কোনো ভৃত্যকে বাধা দিও না'। ১৭৭ অধ্যায়ের ৮৯১ নং হাদিসে বলা হয়েছে ' তোমরা মসজিদের ভেতরে মহিলাদের জায়গাটা কেড়ে নিও না।'

তার মানে আমাদের নবীজীর সময়ে মহিলারা মসজিদে যেতেন। আর নবীজী কখনো তাদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দেননি।

কিন্তু মহিলারা যখন মসজিদে যাবে সেখানে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে সালাত আদায় করবে না। অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ে যেমনটি দেখে থাকবেন তেমনটা হলে লোকজন মসজিদে মহিলাদেরকে উত্যক্ত করবে। সালাতের দিকে মনোযোগ দেবে না। তাই তাদের জন্য আলাদা ঢোকার ব্যবস্থা, আলাদা ওযুর ব্যবস্থা এবং সালাত আদায়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। আর এটাও ঠিক যে, মহিলারা সালাতের সময় পুরুষদের আগে দাঁড়াবে না। এমন হলে পুরুষরা আল্লাহর চেয়ে মহিলাদের দিকে বেশী মনোযোগী হবে।

যদি সৌদি আরবে যান, দেখবেন সেখানেও মহিলারা সালাত আদায় করতে মসজিদে যায়। হারামাইন শরীফেও অর্থাৎ মক্কার মসজিদুল হারামে আর মদিনায় মসজিদে নববীতে মহিলারা যেতে পারে। এমনকি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডেও মহিলারা মসজিদে যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলারা মসজিদে যায়।

ইন্ডিয়ার বেশীর ভাগ মসজিদে মহিলাদের মসজিদের ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয় না। তবে বোম্বের কিছু মসজিদে মহিলাদেরকে ঢুকতে দেয়া হয়। আমি একবার কেরালায় গিয়েছিলাম। সেখানে কম করে হলেও ৫০০টি মসজিদ আছে যেখানে মসজিদে মহিলাদের ঢুকতে দেয়া হয়। সেখানে মহিলাদের আলাদা নামাযের ব্যবস্থা আছে। আর ইনশাআল্লাহ এসব মসজিদের যারা ট্রাস্টি আছেন তারা সহীহ হাদিসগুলো মেনে চলবেন। তারাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মহিলা ভৃত্যদের মসজিদের ভেতরে ঢুকতে কোনো রকম বাধা দেবেন না।

banglainternet.com

প্রশ্ন : আমাদের নবীজীর জীবনের কোন সময়টাতে আল্লাহ সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন? আর শবে মি'রাজের সাথে সালাতের সম্পর্কটা কী?

নবুওয়াত লাভের পর সালাতের নির্দেশ

উত্তর : রাসূল (স) এর জন্ম এবং মৃত্যুর সঠিক দিন তারিখটা আমরা যেমন জানি, সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ আমরা তেমনটা জানি না। তবে নবুওয়াত লাভের প্রথম দিকে নির্দেশটা এসেছিল। কারণ একটা সহীহ হাদিসে উল্লেখ আছে– 'ফেরেশতাদের প্রধান জিবরাঈল (আ) নবীজীকে সালাতের নিয়মটা দেখিয়েছিলেন। জিবরাঈল (আ) তার পা মাটিতে রাখলেন। মাটি থেকে পানি বেরিয়ে আসতে লাগল। তিনি নবীজীকে ওযু করার নিয়মটি দেখালেন আর সালাত আদায়ের নিয়মটাও দেখালেন। আর নবীজী বাসায় এসে এই কাজটি তাঁর স্ত্রী খাদীজা (রা) এর সামনে করে দেখালেন।' তাহলে নবীজী নবুয়াতের প্রথম দিকেই সালাত আদায়ের নির্দেশনা পেয়েছিলেন।

আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। পবিত্র কুরআনের সূরা 'ইসরা' এর ১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। 'আমাদের নবীজী ভ্রমণ করেছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা।' তারপর মি'রাজ বিষয়ে সহীহ বুখারীসহ অন্যান্য সহীহ হাদিস গ্রন্থগুলোতে আরো উল্লেখ আছে, 'সেখানে নবীজী অন্যান্য নবীদের (মূসা, ঈসা) সাথে দেখা করেছিলেন। সেখানে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন মুসলিমরা দিনে ৫০ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। তারপর মূসা (আ) নবীজীকে বললেন ৫০ ওয়াক্ত নামায মুসলমানদের জন্য খুব বেশী হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহর কাছে অনুরোধ করে এটা কমিয়ে নিন। নবীজী গেলেন। সালাতের ওয়াক্ত কমানো হলো । সবশেষ তিনি দিনে ৫ বার নামায আদায়ের নির্দেশ পেলেন এবং বললেন এই ৫ ওয়াক্ত হবে ৫০ ওয়াক্তের সমান।

প্রশ্ন : পুরুষ ও মহিলাদের সালাত আদায়ের নিয়ম আলাদা কেনো?

খুব বেশী আলাদা নয়

উত্তর : বাজারে অনেক বই পাবেন যেখানে সালাত আদায়ের বিভিন্ন নিয়ম কানুন দেয়া আছে। বেশীর ভাগ বইয়েই মহিলা ও পুরুষদের সালাত আদায় পদ্ধতির আলাদা অধ্যায় রয়েছে। সেখানে নিয়মগুলো আলাদা। এমন একটা সহীহ হাদিসও খুঁজে পাবেন না যেখানে বলা হয়েছে যে মহিলারা সালাত আদায় করবে পুরুষদের চেয়ে আলাদা নিয়মে। এমন কোনো সহীহ হাদিস নেই।

আপনারা যদি সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডের ৬৩ নম্বর অধ্যায় পড়েন দেখবেন সেখানে লেখা আছে– উম্মে আবু দারদা (রা) তাশাহুদে বসেছিলেন পুরুষের মতো করেছিলেন আর তিনি ইসলামী নিয়ম-কানুন সম্পর্কে যথেষ্ট বিজ্ঞ।

এ রকম আরও অনেক সহীহ হাদিস আছে, যেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন হযরত আয়েশা (রা)। নবীজীর অন্যান্য স্ত্রীগণও একই বর্ণনা দিয়েছেন। আর অন্যান্য মহিলা সাহাবীদের কেউই বলেননি, পুরুষ এবং মহিলাদের সালাত আদায়ের যে নিয়মগুলো আছে তা একেবারেই আলাদা। সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ড Book of Adhan এর ১৮ তম অধ্যায়ের ৬০৪ নং এবং ৯ নম্বর খণ্ডের ৩৫২ নং হাদিসে আছে– 'নবীজী বলেছেন, ইবাদত কর যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ'।

তাহলে সহীহ হাদিসের আলোকে বলা যায় পুরুষ এবং মহিলা সালাত আদায় করবে একই রকম নিয়মে।

প্রশ্ন : আল্লাহ কেনো আমাদের সবগুলো দোআর উত্তর দেন না অথবা পূরণ করেন না?

উত্তর না দেওয়াও উত্তর

উত্তর : সূরা বাকারার ২১৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থ : 'তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো যদিও তা তোমাদের কাছে অপ্রিয়। এটা হতে পারে, তোমরা যেটা অপছন্দ কর সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যেটা পছন্দ কর সেটা অকল্যাণকর । আল্লাহ সবকিছু জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।'

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, এটা সম্ভব যে, তোমরা যেটা অপছন্দ কর সেটা কল্যাণকর আর যেটা পছন্দ কর সেটা অকল্যাণকর। যেমন ধরুন, একজন খুবই ধার্মিক লোক সে আল্লাহর কাছে দুআ করল 'হে আল্লাহ! আমাকে একটা মটর সাইকেল দাও– তাতে আমার যাতায়াত সুবিধা হবে।' আর আল্লাহ সেই দুআ কবুল করলেন না।

আপনি হয়ত বলবেন, সে খুব ভালো লোক ছিল। খুব ধার্মিক ছিল। তার দুআ কেনো কবুল হলো না? আল্লাহ জানেন যদি লোকটার মটর সাইকেল থাকে, সে Accident করতে পারে। আর পঙ্গুও হয়ে যেতে পারে। তাই পবিত্র কুরআন বলছে তোমরা যেটা কল্যাণকর মনে কর সেটা অকল্যাণকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না। একবার খুব ধনী একজন ব্যবসায়ী একটা চুক্তি

banglainternet.com

করার জন্য লন্ডনের ফ্লাইট ধরার উদ্দেশ্যে এয়ার পোর্টে যাচ্ছিলেন। যে চুক্তিটা করলে তার ১০০ কোটি রুপি লাভ হবে। যখন তিনি এয়ার পোর্টের দিকে যাচ্ছিলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাস্তায় খুব বড় একটা ট্রাফিক জ্যাম ছিল, আর তিনি সময় মতো এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পারলেন না। তিনি যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছলেন ততক্ষণে সেই Flight টা রওয়ানা দিয়েছে। তিনি Flight মিস করলেন। তিনি তখন মন খারাপ করে বললেন, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা। বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় তিনি গাড়ির রেডিওটি অন করলেন। রেডিওতে তখন খবর প্রচার করা হচ্ছিল। সেখানে তিনি যে লেটেস্ট খবরটি শুনলেন তা হলো– তিনি যে ফ্লাইটটিতে লন্ডন যেতে চেয়েছিলেন লন্ডনগামী ঐ বিমানটি ক্রাশ করেছে। আর ঐ প্লেনে যতজন যাত্রী ছিল সবাই মারা গেছে। তখন ঐ ব্যবসায়ী বললেন, এই ফ্লাইট মিস করার ঘটনাটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

কিছুক্ষণ আগেই তিনি ট্রাফিক জ্যামকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন কারণ ট্রাফিক জ্যামের কারণে তার ১০০ কোটি রুপি ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ফ্লাইট মিস করার কারণে তার ১০০ কোটি রুপি ক্ষতি হলেও জীবনটা বেঁচে গেল। আর আল্লাহ জানেন কোনটা কল্যাণকর। অনেক সময় দেখা যায় আল্লাহ আমাদের দুআ কবুল করছেন না। যে দোআ মানুষের জন্য ক্ষতিকর তিনি সে দুআ কবুল করেন না।

আর পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শূরা এর ২৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ۔

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা তার সকল বান্দাকে যদি জীবনে উপকরণের প্রাচুর্য দিতেন তাহলে তারা অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু আল্লাহ তার ইচ্ছেমতই মানুষকে দান করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন।

সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۔

অর্থ ঃ আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে– বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথ পেতে পারে।

সূরা আল-মু'মিন এর ৬০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۔

অর্থ ঃ 'তোমার প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।'

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলছেন, আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। মানুষ ভাবতে পারে যে এই আয়াতটা পূরণ হবার নয়। যদি প্রার্থনার উত্তর না দেয়া হয়। যদি আপনি ভালো করে দেখেন, আল্লাহ আপনার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন উত্তর না দেয়ার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহ জানেন আপনার জন্য কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। আর কিছু মানুষ আছে যারা বলে আমরা এমন অনেক অফিসার দেখেছি যারা অধার্মিক ও বহু ঈশ্বরের উপাসনা করে আর নকল ঈশ্বরের উপাসনা করে টাকার জন্য। আর তারা সম্পদশালী হয়। যদিও এইসব অধার্মিক ও অবিশ্বাসীরা নকল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন কিন্তু আল্লাহই তাদের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে থাকেন। কারণ তিনি জানেন তারা যা প্রার্থনা করছে আর এতে তারা ভবিষ্যতে আরো বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরকালের জীবনে এসবের কারণে তারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হবে। সত্যিকার বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এটা ব্যাপারই না। এটা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয় যে তারা ধনী না গরীব। সুসময় না দুঃসময়। তারপরও আল্লাহকে বিশ্বাস করে।

পবিত্র কুরআনে সূরা নূর এর ৩৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْأَبْصَارُ ۔

অর্থ ঃ এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে সেই দিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।'

যে-ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন সত্যিকারের বিশ্বাসী সবসময় বলে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ মানে সকল প্রশংসা আল্লাহর। এমনকি যদি তার ক্ষতিও হয় সে বলবে আলহামদুলিল্লাহ। কেননা সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। তার আল্লাহ যখন সেই ব্যক্তির ক্ষতিটি হতে দিলেন এতে ভবিষ্যতে তার জন্য আসলে উপকারই হবে। এককথায় সত্যিকারের বিশ্বাসী সে বিশ্বাস করে যা কিছু হয়েছে ভালোর জন্য হয়েছে। তারা শুধু আখিরাতে ভয় করে। কিয়ামতের দিন যেদিন আমাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে।

banglainternet.com

প্রশ্ন : আমরা জানি, জুমআর সময় খুতবা ঠিক সালাতের অংশ নয় তাহলে আরবি ভাষায় এই খুতবা প্রদান কি আবশ্যিক?

মূল অংশ আরবিতে আবশ্যিক

উত্তর : এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র ইমাম আলী বলেছেন, আরবিতে খুতবা পড়া আবশ্যিক। অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞরা যেমন– ইমাম হানিফা , ইমাম শাফি, ইমাম হাম্বলসহ, এমন বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যে কোনো ভাষায় খুতবা দেয়া যাবে তবে জুমার খুতবার ভেতরে যে বিষয়গুলো থাকতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করা, আমাদের নবীজীর জন্য দুআ করা। আর জুমার খুতবায় যে আরবি আয়াতগুলো পড়া হয় সেগুলো অবশ্যই আরবিতে হতে হবে। বাকি অংশগুলো অন্য যে কোনো ভাষায় হতে পারে। 'জুমআর খুতবা অন্য কোনো ভাষায় দেয়া যাবে না' এমন কোনো সহীহ হাদিস পাবেন না। তবে আমি এটাও জানি নবীজী সবসময় আরবীতে খুতবা দিয়েছেন। কারণ সে সময় আরব দেশের লোকেরা শুধু আরবি ভাষাই জানত ও বুঝত। কিন্তু কোনো হাদিসই বলছে না আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায়ই খুতবা দেয়া যাবে না।

নবীজী কোনো লোককেই বলেননি আরবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দেয়া যাবে না। জুমআর সময় খুতবা দেয়ার কারণটা হলো এতে সমবেত লোকদের আল্লাহ এবং নবীজীর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করা যায়। এছাড়াও এর মাধ্যমে সমবেত লোকজন জানতে পারে তাদের আশেপাশে ইদানিং কী ধরনের ঘটনা ঘটছে। এককথায় খুতবার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে পথ দেখানো হচ্ছে। যে ভাষাটা শ্রোতা বোঝে না সে ভাষায় বক্তব্য দেয়াটা খুবই অযৌক্তিক হবে। বাস্তবক্ষেত্রে আপনি কাউকে উপদেশ দেবেন এমন ভাষায় যে ভাষাটা সে বোঝে।

আপনি যদি আমেরিকা যান, তবে দেখবেন সেখানে অনেক মসজিদেই ইংরেজিতে খুতবা দেয়া হয়। বিশ্বে অনেক মসজিদ আছে সেখানে খুতবা দেয়া হয় স্থানীয় ভাষায়। আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, দ.আমেরিকার অনেক মসজিদে খুতবা দেয়া হয় ইংরেজিতে। যদি আপনি আরব বিশ্বে যান তবে দেখবেন সেখানে আরবিতে খুতবা দেয়া হয়। তবে কুয়েত ভ্রমণের সময় আমি সেখানে বেশ কয়েকটি মসজিদে ইংরেজিতে খুতবা দেয়া দেখেছি যদিও সেখানকার সবাই আরবি বোঝে। কিছু মসজিদে খুতবা দেয়া হয় উর্দুতে, কিছু মসজিদে মালয়ালাম আর অন্যান্য

ভাষায়। মসজিদগুলোকে সরকার বিশেষ অনুমতি দিয়েছে যেন বিদেশী লোকজন যারা কুয়েতের নাগরিক নয়, চাকরি করার জন্য কুয়েতে এসেছে তাদের জন্য এই খুতবা বোধগম্য ভাষায় দেয়া হবে।

তাহলে খুতবা যেকোনো ভাষায় দেয়া যাবে। কিন্তু এখানে শর্ত হলো আল্লাহর প্রশংসা আরবিতে হতে হবে। আর আমাদের নবীজীর জন্য দুআও আরবিতে হতে হবে। খুতবার সময়ের দুআও আরবিতে হতে হবে। এই আয় মাত্র কয়েকটি আয়াত বা লাইন রয়েছে। খুতবার সময় এগুলোর অনুবাদও করতে পারবেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। হক কথা বলার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। যখন খুতবা পড়া হবে তখন তা স্থানীয় ভাষায় পাঠ করুন, যেটুকু আরবিতে বলতে বলেছি সেটুকু ছাড়া। আর ভারতে দেখবেন সেখানকার বেশীর ভাগ জায়গায় যেখানে মসজিদগুলো বিদেশীরা অর্থাৎ ইন্ডিয়ার অভিবাসীরা নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে আরবি ভাষায় খুতবা দেয়া হয়।

কিছু মসজিদে দেখবেন প্রি-খুতবা। নতুন জিনিস প্রি-খুতবা, যা স্থানীয় ভাষায় দেয়া হয়। কোনো কোনো মসজিদে খুতবার অনুবাদ করা হয় জুমআর সালাতের পর। তাই আমি অনুরোধ করব আর আল্লাহর কাছে দুআ করব তিনি যেন এসব লোকদের হিদায়াত করেন। আমরা যেন স্থানীয় ভাষায় খুতবা শুনতে পারি। প্রতি সপ্তাহে জুমআর সময় দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারি।

প্রশ্ন : পৃথিবীতে প্রথম আযান কে দিয়েছিলেন? কোথায় দিয়েছিলেন? আর এই আযান কোন্ দেশে শুরু হয়েছিল?

মদীনায় আযানের প্রচলন হয়

উত্তর : আযান শুরু হয়েছিল আরব দেশে। আরবের মদিনায়। আর সহীহ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, মদিনায় মসজিদ তৈরী করার পর নবীজী এবং সাহাবারা সালাতের জন্য আলাপ করছিলেন কীভাবে মানুষকে আহ্বান করা হবে? কেউ কেউ বলেছেন তখন একজন লোক স্বপ্নের মধ্যে আযান শুনতে পেলেন। তিনিই মানুষের কণ্ঠে আযানের আওয়াজ শোনেন। খবরটা তখন নবীজীর কাছে পৌঁছে গেল। আর নবীজী বললেন, সে যে কথাগুলো শুনেছে সে কথাগুলো শুনতে বেশ ভালো লাগছে। আর সালাতের জন্য মানুষকে আহ্বান করতে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই যেখানে মানুষের কণ্ঠে আহ্বান জানানো হচ্ছে। তখন নবীজী আদেশ দিলেন যখন নামাযের সময় হবে তখন মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করবে। অন্যান্য যন্ত্রপাতি- ড্রাম, ট্রাম্পেট, ঢাক ইত্যাদি ব্যবহার করো না। আর আযান প্রথম শুরু হয়েছিল মদিনায়।

banglainternet.com

প্রশ্ন : সালাত আদায়ের অনেকগুলো নিয়ম আছে। এর সবগুলো কি ঠিক? নাকি সালাত আদায়ের একটা বিশেষ নিয়ম আছে?

সালাতের মূল নিয়ম অভিন্ন

উত্তর : সালাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কিত অনেক বই বাজারে রয়েছে। বেশীর ভাগ বইতেই কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো সহীহ হাদিস নয়। সালাত আদায়ের জন্য কেবল একটি নিয়ম রয়েছে।

সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডের Book of Adhan এর ১৮ নম্বর অধ্যায়ের ৬০৪ নম্বর হাদিসে নামায সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এছাড়াও বুখারী শরীফের ৯ নম্বর খণ্ডের ৩৫২ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে। নবীজী বলেছেন 'ইবাদত কর যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছ।' আমরা সালাত আদায় করব সেই নিয়ম মেনে যেভাবে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স) আদায় করেছেন। অন্য কোনো নিয়ম নেই। তাহলে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো যেমন– কীভাবে হাত বাঁধতে হবে, রুকুতে যেতে হবে, সিজদা দিতে হবে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির ব্যাপারে মাত্র একটি পদ্ধতি রয়েছে। আর সহীহ হাদিসে এই নিয়মগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাতের কিছু কিছু ব্যাপারে এই নিয়মগুলো কিছুটা শীথিল। যেমন ধরুন, আমরা রুকুতে যেটা পড়ি; সহীহ হাদিস বলছে, কখনও কখনও নবীজী 'সুবহানা রাব্বিআল আযিম' (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সুমহান) পড়তেন। আবার কখনও তিনি বলেছেন– 'সুবহানা রাব্বিআল আযিম ওয়া বিহামদিকা' অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সুমহান, সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তাহলে এমন কিছু কিছু দোয়ার ব্যাপারে শীথিলতা আছে যেগুলো আমাদের নবীজী পড়েছেন রুকুর সময়, সিজদার সময়। যেমন– ধরুন, বেতেরের সালাতের সময় বেজোড় রাকাতের সালাত আদায় করতে হয়। এটা আল্লাহর নির্দেশ। নবীজী কখনো পড়েছেন এক রাকাত, কখনও পাঁচ রাকাত বা সাত রাকাত। বেশীর ভাগ সময় তিন রাকাত। তাহলে এমন কিছু বিষয়ে শীথিলতা আছে। যখন আপনি রুকুতে বা সিজদায় গিয়ে কিছু পড়ছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেহের অঙ্গভঙ্গি– যেভাবে দাঁড়াবেন, বসবেন বা মাথা নাড়াবেন, সিজদায় যাবেন– এমন কিছু নিয়ম মাত্র একটাই। আর সহীহ হাদিসে এগুলোর সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। এখানে আমি যে বইটার নাম বলতে পারি সেটা হলো 'The Guide to Salah'। লিখেছেন M. A. SAKI. আপনাদের যদি বেশী সময় থাকে এবং বিস্তারিত জানতে চান, তাহলে পড়ুন The prayer of the prophet (sm). সালাতের বিভিন্ন নিয়ম এখানে বিস্তারিত পাবেন। লিখেছেন শেখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি। এ বইটিতে সহীহ হাদিসের অনেক উল্লেখ আছে। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো সালাত আদায়ের সময় এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিয়ম একটাই।

প্রশ্ন : আলিফ লাম মিম– এগুলো সম্পর্কে নবীজী আমাদেরকে কিছু বলে যাননি। সাহাবীরা পরবর্তীকালে কি এগুলো সম্পর্কে কিছু বলেছেন বা এগুলো সম্পর্কে কেউ কিছু জানতেন? না বলা হয়নি? নাকি কেউ জানে না? ঘটনাটা কী?

অলৌকিকত্ব ও চ্যালেঞ্জের প্রতীক

উত্তর : এটা একেবারেই মৌলিক। কারণ এখান থেকেই কুরআন শরিফের শুরু। আর তারপর সবকিছু। এই সংক্ষিপ্ত অর্থগুলো পুরো জানতে চাইলে আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন, সেখানে বিস্তারিত আছে। এই অক্ষরগুলো আছে ২৯ টি সূরার আগে। আর এ বিষয় নিয়ে অনেক বই লিখা হয়েছে। কিছু মানুষ বলে এটা আল্লাহর সংক্ষিপ্ত রূপ। আবার কেউ বলে এটা আল্লাহর Sign. কেউ কেউ বলে এটা আল্লাহর নাম। কারও কারও ধারণা এটা বলে জিবরাঈল (আ) নবীজীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। আর নবীজী এটা বলে অন্যান্য লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন, এমন অনেক ব্যাখ্যা আছে। তবে সবচেয়ে খাঁটি আর সঠিক উত্তর হলো এই সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলো। এটা মানুষের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সূরা বনী ইসলাঈল এর ৮৮ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۔

অর্থ : বলুন, যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনোও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।

সূরা তুর এর ৩৪ নং আয়াতে অছে, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۔

অর্থ : যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোনো রচনা উপস্থিত করুক।

সূরা হুদ এর ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۔

অর্থ : তারা কি বলে, কুরআন তুমি তৈরি করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরি করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে।

banglainternet.com

এছাড়া সূরা ইউনুস এর ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۔

অর্থ ঃ মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটি সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

আর এই চ্যালেঞ্জ আস্তে আস্তে সহজ হয়েছে। আর চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে সূরা বাকারা এর ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে–

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۔

অর্থ ঃ এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

আল্লাহ তাআলা এখানে চ্যালেঞ্জ করেছেন পবিত্র কুরআনের মতো একটি সূরা রচনা করতে। তাহলে আল্লাহ যখন বলছেন–

الٓمٓ - حٰمٓ - طٰسٓ তিনি এখানে বলছেন, আরবদেরকে। কুরআন নাযিল হয়েছিল আরবি ভাষায়, কারণ আরবদের ভাষা ছিল আরবি। আর স্থানীয় লোকদের ভাষাও ছিল আরবি।

তাই আল্লাহ এখানে পরোক্ষভাবে বলছেন, আরবি তো তোমাদের ভাষা, (ইংরেজি– A B C D যেমন ইংরেজদের ভাষা) তাই এ অক্ষরগুলো নিয়ে তোমরা গর্ব কর। কারণ কুরআন যখন নাযিল হয়েছিল আরবরা তখন তাদের ভাষা নিয়ে বা আরবি ভাষা নিয়ে গর্ব করত। আরবি ভাষা তখন ছিল উন্নতির চরম শিখরে। আরবরা যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশী গর্ব করত তা ছিল তাদের ভাষা। সে সময়টা সাহিত্যের যুগ, তখন আরবি সাহিত্যও ছিল খুবই সমৃদ্ধ, এগুলো নিয়ে তারা সবচেয়ে বেশি গর্ব করত।

তাই আল্লাহ বলছেন, এগুলো তোমাদের ভাষার অক্ষর। অক্ষরগুলো নিয়ে তোমরা গর্ব কর। আমি তোমাদের জন্য পবিত্র কুরআন রচনা করেছি। আল্লাহ পৃথিবীর সব মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সুযোগ থাকলে জিনদেরও সাহায্য নিতে বলেছেন।

banglainternet.com

এখানে আল্লাহ ছাড়া যে কারো সাহায্য নিতে বলে কুরআনের সূরার মতো আরেকটি সূরা নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা খুবই ছোট। মাত্র ৩টি অক্ষরও আছে। তাহলে আল্লাহ যখন বলেছেন, الٓمٓ - حٰمٓ - طٰسٓ। -এরপরে যখনই পবিত্র কুরআনে এ অক্ষরগুলো দেখবেন, লক্ষ্য করবেন, এ অক্ষরগুলোর পরেই পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন– ধরুন, সূরা বাকারায় বলা হয়েছে–

الٓمٓ ۔ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۔

অর্থ ঃ 'এটি এমন কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ।

অনেক অমুসলিম চেষ্টা করলেও আয়াত রচনায় সফল হয়নি। ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না।

প্রশ্ন : কিছু মানুষকে দিনে ৩ বার নামায পড়তে দেখা যায়, এভাবে সালাত আদায়ের কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?

সালাত ৫ ওয়াক্তই ফরয

উত্তর : কুরআনে আছে, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। অথচ কিছু মানুষ ৩ ওয়াক্ত নামায পড়ে। এখন প্রশ্ন হলো এটার যুক্তি আছে কি- না?

পবিত্র কুরআন অনুযায়ী আমরা প্রত্যেক দিন ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদেরকে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। সূরা হুদের ১১৪ নম্বর আয়াতে, সূরা ইসরার ৭৮ নম্বর আয়াতে, সূরা ত্বাহা'র ১৩০ নম্বর এবং সূরা-রূম এর ১৭ ও ১৮ নম্বর আয়াতে– '৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করা আবশ্যিক' বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা 'নিসা'এর ১০১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۔

অর্থ ঃ যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

কুরআনের ভাষ্যমতে, যোহর, আসর ও এশার নামায ৪ রাকাতের জায়গায় ২ রাকাত আদায় করা যায়। আর যখন সফর করবেন তখন দুই ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়তে পারবেন– যোহর ও আসর একসাথে আদায় করা যাবে; এছাড়া মাগরিব ও এশার নামায একসাথে আদায় করা যায়। এভাবে দু'ওয়াক্ত নামায

একসাথে আদায় করার রীতিটি ঠিক আছে। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, নবীজীর সময়ে একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। লোকজন মাগরিবের সালাতের পর এশার সালাতের জন্য আসতে পারবে না। নবীজী তাই দুই ওয়াক্তের সালাত একসাথে পড়লেন। তাহলে কোনো অসুবিধা বা বিপর্যয় হলে নবীজী দুই ওয়াক্ত একসাথে আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন।

কিন্তু এমন কিছু লোকজন আছে তারা বলে, ও আমাকে তো অফিসে যেতে হবে সেজন্য আমি আসরের সালাত আগে পড়ে নেব অথবা আপনি কেনাকাটা করতে মার্কেটে গেছেন, সেখানে কিছু সময় লাগবে তাই সেখানেও যাবার আগে আপনি যোহর ও আসরের সালাত একসাথে আদায় করবেন– এমনটার অনুমতি নেই। সফরের সময় অথবা যখন সত্যিই অসুবিধায় পড়বেন তখন অনুমতি আছে। এছাড়া স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া আবশ্যক।

প্রশ্ন : সালাত আদায় করা কি আবশ্যিক? নিজের মতো কি প্রার্থনা করা যাবে না? আর আল্লাহ কি সেটা কবুল করে নেবেন না? আগের দিনে নবী-রাসূলগণও কি দিনে ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন?

নিজের মতো প্রার্থনা করা যায় না

উত্তর : দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সকল নবী-রাসূলই সালাত আদায় করেছেন। আর তাদের প্রত্যেকেই অন্তত একই পদ্ধতিতে সিজদা দিয়েছেন। তবে সকল রাসূল হয়ত আমাদের নিয়মে সালাত আদায় করেননি।

পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদা'র ৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থ ঃ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।'

পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পর আমাদের দ্বীন সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে রাসূলগণ সালাত আদায় করেছেন, সিজদাও দিয়েছেন। তবে সবগুলো নিয়ম হয়ত একরকম ছিল না। হয়তো কিছু ব্যাপারে মিল ছিল। তবে একই নিয়ম ছিল না।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, সামাজিক উপকার, ভ্রাতৃত্ব ও একতা বৃদ্ধি সাম্য সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে আমরা একই নিয়মে সালাত আদায় করি। যদি আপনি চেয়ারে বসে বাসায় সালাত আদায় করেন তাহলে আপনি এইসব উপকার পাবেন না।

আপনার নিয়মে সালাত আদায় করলে নামাযের সামাজিক, ব্যক্তিক, শারীরিক, মানসিক প্রভৃতি উপকার থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন।

এই নিয়মগুলো আমাদেরকে শিখিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। যদি আপনি নিজেকে নবীর চেয়ে বড় মনে করেন, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে সফল হবেন না।

সূরা আলে ইমরান এর ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করেছিল আর আল্লাহ ও কৌশল করেছিলেন। আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌসুলি।

তাহলে আল্লাহ বলছেন এটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম। যদি আপনি নিজেকে আল্লাহর চাইতে উন্নত মনে করেন তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে ব্যর্থ হবেন।

আল্লাহ কুরআনের মতো একটা সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ করেছেন। মানুষ চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। যদি কেউ মনে করে আল্লাহ আর রাসূলের চেয়ে সে উন্নত, যদিও এটা একটা কুফরি– এজন্যই অবিশ্বাসীরা নিজেদের নিয়মে প্রার্থনা করে।

কিন্তু যে লোক পবিত্র কুরআনে বিশ্বাস করে, আল্লাহ এবং রাসূলকে বিশ্বাস করে তারা রাসূলের নিয়মেই নামায আদায় করবে। আর কুরআন বলছে– 'আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল– অর্থাৎ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর'।

প্রশ্ন ঃ একবার আমি আমার এক ফিলিপিনো মুসলিম বন্ধুকে নামায পড়তে বললাম। সে বলেছিল যে সে অনেকবার কাবা শরীফে সালাত আদায় করেছে। আর কাবা শরীফে একবার সালাত আদায় এক লক্ষ সালাতের সমতুল্য। তাই আগামী কয়েক বছরে আমার সালাত আদায়ের কোনো প্রয়োজন নেই। কীভাবে এটার উত্তর দেব?

ফরয ও তুলনা এক নয়

উত্তর : আপনি বললেন আপনার বন্ধুকে সালাত আদায় করতে বললে সে আপনাকে বলেছে সে সালাত আদায় করেছে মসজিদুল হারামে। আর একবার সালাত আদায় অর্থ এক লক্ষবার সালাত আদায়ের সমান। সে জন্য কয়েক বছর তার সালাত আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। তার এই কথার কিছু অংশ সঠিক। এ সম্পর্কে সহীহ হাদিস আছে। নবীজী (স) বলেছেন, মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করা অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার বার সালাত আদায়ের সমান। শুধুমাত্র মক্কার মসজিদ বাদে। আর কেউ যদি মক্কার পবিত্র মসজিদে সালাত আদায় করে সেটা অন্য যে কোনো মসজিদে এক লক্ষ নামায পড়ার সমান। আর এ

banglainternet.com

বিষয়ে আমিও একমত। তবে মানুষজন এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ বোঝে না। এখানে আপনি অনেক সওয়াব পাবেন। এই মসজিদে সালাত আদায় করলে অনেক সওয়াব পাবেন তবে এজন্য আপনার অন্যান্য ফরয সালাত আদায় করার জরুরত মাফ হবে না। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটি বলেননি যে, যদি এখানে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন তাহলে এক লক্ষবার ফরয সালাত আদায় করতে হবে না। না এটা এমন নয়। এখানে সালাত আদায় করলে আপনি এক লক্ষ সওয়াব বেশি পাবেন।

বোঝার সুবিধার জন্য আরেকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পরীক্ষায় অনেক ধরনের বোনাস মার্ক থাকে। যদি আপনি ক্রিকেট প্লেয়ার হন তবে ৫ নম্বর পাবেন। মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়রিং কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় কিছু বাড়তি নম্বর থাকে খেলাধূলা। যেমন– ব্যাডমিন্টন, ফুটবলের জন্য। যদি আপনি ক্রিকেট প্লেয়ার হন তাহলে ক্রিকেটের জন্য। ফুটবল প্লেয়ার হলে আপনি অতিরিক্ত ৩, ৪, ৫ নম্বর পাবেন। তাহলে ব্যাপারটা হলো, এই নম্বরটা পাবেন তখন যখন ভর্তির জন্য ৯৫% নম্বর প্রয়োজন হবে। আপনি যদি ৯৪ নম্বর পান তাহলে এ বোনাস নম্বর কাজে লাগিয়ে আপনি তখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি সারাদিন ধরে শুধু ক্রিকেটই খেলব। সারাবছর। সারা জীবন খেলব। এভাবে অতিরিক্ত ৫,৫ নম্বর নিয়ে যখন ১০০ নম্বর হবে তখন মেডিকেলে ভর্তি হয়ে যাব, সেকি ভর্তি হতে পারবে? বোনাস মার্ক নিয়ে ভর্তি হতে পারবে না। তাই মসজিদে হারামে নামায পড়লে সে অতিরিক্ত সওয়াব পাবে কিন্তু এর জন্য তার ফরয ইবাদত মাফ হবে না।

প্রশ্ন : ভারতে যারা মসজিদে নামায পড়ে তাদের জন্য টুপি পরাটা আবশ্যিক। কিন্তু ইরান আর মরক্কোতে যারা মসজিদে নামায পড়ে তারা মাথায় টুপি পরে না। তাদের মাথা কিছু দিয়ে ঢাকা থাকে না কেনো?

নামাযে টুপি পরা ভালো

উত্তর : পবিত্র কুরআন বা হাদিসের এমন কোথাও উল্লেখ নেই যেখানে টুপি পরা ফরয বলা হয়েছে। তবে, সহীহ হাদিসে এমন কথা আছে যে, সাহাবারা মাথা ঢেকে রাখতেন। এখানে আপনি মাথা ঢেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, আমাদের প্রচ্যের সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা দেখাতে টুপি পরা হয়। কিন্তু যদি ইংল্যান্ডে যান তবে দেখবেন তারা 'হ্যালো মাম, হাউ আর ইউ' বলে, তারপর টুপি খুলে ফেলে। পশ্চিমারা শ্রদ্ধা দেখাতে টুপি খুলে ফেলে আর প্রাচ্যের লোকজন শ্রদ্ধা জানাতে টুপি পরে। তবে আমরা মুসলিমরা পশ্চিম বা প্রচ্যের কোনো Culture মেনে এটা করি না। এভাবে আমরা শ্রদ্ধা দেখাই। হাদিসেও

আছে সাহাবারা সালাতের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। হয় টুপিতে না হয় কোনো কাপড় দিয়ে।

তবে মুসলিমরা যদি টুপি ছাড়া সালাত আদায় করেন ইনশাআল্লাহ সেই নামায আল্লাহ কবুল করবেন, টুপি ফরয নয়। তবে নামায আদায়ের সময় টুপি পরাটা ভালো।

প্রশ্ন : কোনো অমুসলিম কি সালাত আদায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে?

সালাত মুসলিমকেই আদায় করতে হয়

উত্তর : লোকটি যদি মন থেকেই সালাতে অংশগ্রহণ করে তবে সবার আগে তাকে ঈমান আনতে হবে। যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে চান তাকে সুস্বাগত। আর সালাত তখনই কবুল হবে যদি বিনয়ী ও নম্রভাবে আদায় করেন। যদি আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকে তাহলেই সে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে। আর সালাত আদায় করবে। কিন্তু সে যদি বলে– না, আল্লাহকে বিশ্বাস করে নয়, আপনার সাথে সাথেই এ কাজটি করতে চাই। তিনি তা করতে পারেন। তবে তখন এই কাজটি হয়ে যাবে জিমন্যাস্টিক বা ব্যায়াম। কারণ বিশ্বাস ছাড়া সালাত কোনো কাজেই আসবে না। কার কাছে প্রার্থনা করবেন? যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর সালাত আদায় করেন তবে আল্লাহ তা কবুল করবেন। যদি কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস না করে মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে তার সম্পর্কে সূরা মাউনে বলা হয়েছে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ..... الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ .

অর্থ ঃ 'দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীর ..... যে মানুষকে দেখানোর জন্য নামায আদায় করে'।

সূরা নিসার ১৪২ নম্বর আয়াতে আছে।

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا .

অর্থ ঃ অবশ্যই 'মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শীথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

তাহলে কুরআন বলছে এরা সালাতকে অবহেলা করে। অমুসলিমরা সালাতে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এতে তারা ন্যায়-নিষ্ঠার পথে পরিচলিত হবে না। তারা মুনাফিক। তারা ধোঁকাবাজ। ধোঁকাবাজরা নামায পড়তে চাইলে পড়তে পারে কিন্তু

banglainternet.com

সেটা শুধু লোক দেখানোর জন্য। কিন্তু কেউ যদি মুসলিম হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে তাহলে সে করতে পারে।

প্রশ্ন : আমরা কি অমুসলিমদের বাসায় সালাত আদায় করতে পারি?

সালাতের পরিবেশ থাকতে হবে

উত্তর : 'সহীহ বুখারী' -এর প্রথম খণ্ড 'সালাত' আধ্যায়ের ৪২৯ নং হাদিসে উল্লেখ আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– 'পুরো পৃথিবীটা আমার এবং আমার অনুসারীদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে, একটি মসজিদ হিসেবে'।

আপনি পৃথিবীর যে কোনো স্থানে সালাত আদায় করতে পারেন। তবে জায়গাটি পবিত্র বা পাক থাকতে হবে। এছাড়াও কিছু নিয়ম কানুন আছে। যদি কোনো অমুসলিমের ঘরে নামায পড়তে চান তবে পরিষ্কার ও পাক বা পবিত্র জায়গা বা পাক ও পরিষ্কার কাপড়ে নামায আদায় করতে পারেন। খেয়াল রাখবেন যেখানে নামায পড়বেন তার সামনে যেনো কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে। মাঝে একটা সুত্রা রাখবেন যেন দেয়াল থেকে একটি দূরত্ব বজায় থাকে। তবেই আপনি সেখানে নামায পড়তে পারেন।

প্রশ্ন : সালাত আদায়ের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পোশাকটি কি কোর্তা–পায়জামা? না প্যান্ট–শার্ট?

পোশাকে ফরয শর্ত পূরণ জরুরি

উত্তর : সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পোশাকের ন্যূনতম শর্ত হলো মহিলারা ঢিলা পোশাকে পুরো শরীর ঢাকবে। তবে মুখ ও কব্জির কাছে পোশাকটা টাইট থাকবে। পুরুষদের জন্য কমপক্ষে নাভি থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকতে হবে। পুরো শরীর ঢাকা–সেটা বেশি গ্রহণযোগ্য। এখন কথা হলো কুর্তা-পায়জামা না কি প্যান্ট-শার্ট-টাই পরবেন।

যদি আপনি পোশাকের শর্তটা মেনে চলেন তবে আপনি যে পোশাকে আরাম বোধ করবেন সেটাই পরা যাবে। যদি পশ্চিমা কাউকে কুর্তা-পাজামা পরতে বলি তবে সে স্বস্তি পাবে না। যদি গ্রামের কাউকে শার্ট-প্যান্ট পরতে বলি তবে সেও স্বস্তি পাবে না। তাহলে আপনি যদি সালাত আদায়ের সময় সহীহ হাদিসে বর্ণিত ন্যূনতম পোশাক পরিধান করেন তবে সেটা ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে যাবে না। তবে পোশাকের মধ্যে এমন কিছু থাকা যাবে না যেটা অবিশ্বাসীদের থাকে। অর্থাৎ পোশাকটি যদি হারাম না হয়। সবগুলো শর্ত পূরণ করে যে পোশাক পরে আরাম বোধ করেন সে পোশাক পরেই সালাত আদায় করতে পারেন।

প্রশ্ন : মুসলিম ধর্মের সালাতের সাথে অন্য ধর্মের প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্য কী? যেমন পূজা, পার্বণ ইত্যাদি। আর সালাত বাদে এসব প্রার্থনাগুলোর মধ্যে কি কোনো সমস্যা আছে?

প্রার্থনার মূল লক্ষ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টি

উত্তর : আমরা মুসলিমরা যেভাবে ইবাদাত করি আর অন্যান্য ধর্মাবলীরা যে প্রার্থনা করে যেমন পূজা পার্বণ, এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় করি আর মুসলিমরা আল্লাহকে মেনে চলে। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যাকে স্রষ্টা বলে আমরা তাকে মহান স্রষ্টা বলে মানি না। যেমন ধরুন, একজন লোক মূর্তি পূজা করে, মূর্তিকে আমরা মহান স্রষ্টা বলি না।

আর যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন, দেখবেন সেগুলোও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে। তাই আমরা মুসলিমরা যা করব সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
অর্থ : 'আস সেই কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে এক।'

(সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

যদি কোনো হিন্দু আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি যদি মূর্তি পূজা করি তাহলে সেটা ঠিক না ভুল। আমি সে লোককে বলব, জজুর্বেদ এর-৪২ নাম্বার অধ্যায়ের ৩ অনুচ্ছেদ বলেছে 'না তাস্তি প্রতিমা আস্তি'- মহান সৃষ্টি কর্তার কোনো প্রতিমূর্তি বানানো যাবে না। তাই আপনারা যা করছেন সেটা ভুল।

'ভগবত গীতা'র ৭ম অধ্যায়ের ১৯ থেকে ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'যে সব লোক জাগতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন তারা সকল ঈশ্বরের পূজা করে। পূজা করে মিথ্যা ঈশ্বরের। যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে তারপরও আমি তাদের ইচ্ছা পূরণ করি।'

'যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে তারা মিথ্যা ঈশ্বরের রাজত্বে যাবে। যারা আমার উপাসনা করে তারা আমার কাছে আসবে।'

আমি একজন মুসলিম হিসেবে অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনারা যা করছেন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী তা ভুল। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বলছে এভাবে প্রার্থনা করা ভুল। অথচ কিছু লোক কেনো বিভিন্ন মূর্তির পূজা করে এ বিষয়ে পাল্টা যুক্তি দাঁড় করায়।

কোনো খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন সে বাইবেলের নির্দেশ মেনে চলে না। পবিত্র বাইবেল বলছে, 'সকল নবী রাসূল সালাত আদায়ের আগে সিজদা করেছেন। সালাত আদায়ের আগে হাত ধুয়েছেন।' মুসা ধুয়েছেন, হারুন ধুয়েছেন, তারা

banglainternet.com

সিজদাও দিয়েছেন। তবে এখন খ্রিষ্টানরা হাতও ধোয় না, সিজদাও করে না। অর্থাৎ তাদের ধর্মগ্রন্থ যা বলছে তারা তা মেনে চলছে না।

এরপরও তাদের বলতে চাই কুরআন হচ্ছে শেষ আসমানী কিতাব। এখানেই ইবাদতের শ্রেষ্ঠ নিয়ম রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে নামায পড়তে। মহিলারাও কি একইভাবে নামায পড়বে?

পদ্ধতি এক, ব্যবস্থা আলাদা

উত্তর : আপনি যদি বলেন, পুরুষ আর মহিলারা কি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে তাহলে এটা ঠিক নয়। বর্তমানে Medical Science আমাদের বলে মহিলাদের তাপমাত্রা ১° বেশী। তার কাঁধ আপনার কাঁধ স্পর্শ করলে নরম লাগবে। আপনি তখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার দিকে মনোযোগী হবেন। তাহলে পুরুষরা সালাতের সময় কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। মহিলারাও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু পুরুষ আর মহিলারা এক সাথে সালাত আদায় করবে না। সালাতের অন্যান্য নিয়মগুলো পুরুষ আর মহিলাদের জন্য সমান। মহিলা ও পুরুষদের নামায আদায় পদ্ধতি এক কিন্তু আলাদা ব্যবস্থা থাকবে।

প্রশ্ন : রামাদানে এশার সময় আমরা মহিলারা পারিবারিক সমস্যার কারণে মসজিদে যেতে পারি না। তাহলে আমরা যদি বাসায় ২০ রাকাত নফল নামায পড়ি, তাহলে আমরা কুরআন খতম দিতে পারব না, সেক্ষেত্রে কি এই সওয়াব পাব, না কি আমরা মসজিদে যাব?

মসজিদের নামাযেই বেশি সওয়াব

উত্তর : রমযান মাসে এশার পরে আমরা তারাবিহ নামায পড়ি। কিন্তু পারিবারিক কারণে মহিলারা মসজিদে যেতে পারে না। যদি মসজিদে ব্যবস্থা না থাকে কিংবা যেতে না পারেন তবে বাসায় পড়া যাবে। তবে ভালো হয় যদি মসজিদে যান। যদি বিশেষ কারণে মসজিদে যেতে না পারেন তাহলে আপনি একাও পড়তে পারেন। তাহলে এখানে কি সওয়াব সমান? স্বাভাবিকভাবে মসজিদে বেশী সওয়াব পাবেন। কিন্তু কুরআনে হাফিয না হলে আপনি বাসায় নামায পড়ে কুরআন খতম দিতে পারছেন না। তবে নামায না পড়ার চেয়ে বাসায় পড়াই ভালো। আর সওয়াবের কথা বললে জামাতের সওয়াব অনেক বেশী। সহীহ বুখারীর প্রথম খণ্ডে আছে, আমাদের প্রিয় নবী বলেছেন, মসজিদে নামায পড়লে ২৫ গুণ সওয়াব বেশী পাবে অথবা ২৭ গুণ বেশী সওয়াব পাবে। তাহলে জামাতে সালাত আদায় করলে বাসার চেয়ে বেশী সওয়াব পাবেন।

ইসলামিক লেবেল

প্রশ্ন : ১৯৯৩ সালের দাঙ্গার সময় ইসলামের লেবেল ধারীদের খুঁজে বের করে হত্যা করা হতো। সুতরাং ঐ অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগানো কি উচিত হবে?

ঝুঁকি থাকলে লেবেল অপরিহার্য নয়

ডা. জাকির নায়েক : প্রতিটি নিয়মেরই কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। অনুরূপ ইসলামি শরীয়াহও জীবনের ঝুঁকি থাকলে নিয়মের ব্যতিক্রম করার সুযোগ দেয়। যেমন– কোনো অমুসলিম যদি কোনো মুসলিমের মাথায় বন্দুক ধরে এবং জিজ্ঞেস করে সে কি মুসলিম না অমুসলিম। এ ক্ষেত্রে ঐ মুসলিমের জন্য নিজেকে অমুসলিম বলে পরিচয় দেয়া গোনাহর কারণ হবে না। সুতরাং কোনো অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় যদি রায়ট হয়, সেখানে কোনো মুসলিম তার জীবন বাঁচাতে গিয়ে নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করতে পারবে এবং ইসলামি লেবেল খুলে ফেলতে পারবে। তবে এ অবস্থায় কেউ যদি নিজের লেবেল না খোলার কারণে নিহত হয়, সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

পবিত্র কুরআন-এর সূরা বাকারা-এর ১৭৩ তম আয়াতে উল্লেখ আছে,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থ : তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং না-ফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

সূরা আনআমের ১৪৫ নং, সূরা মায়িদার ৩ নং এবং সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতেও অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে। এ আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, শূকরের গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন স্থানে যায় যেখানে শূকরের গোশত ছাড়া আর কোনো খাবার নেই এবং গোশত না খেলে

banglainternet.com

জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে তাহলে সেখানে ততটুকু পরিমাণ শূকরের গোশত খাওয়া যেতে পারে যতটুকু না খেলে একজন বাঁচে না।

সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেসব ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন দেখা দেয় সেসব ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়াহ ছাড় দিয়েছে।

প্রশ্ন : কোনো অমুসলিমকে কি আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দেয়া যাবে? অথবা কোনো অমুসলিম সালাম দিলে কি জবাবে ওয়া-আলাইকুমুসসালাম বলা ঠিক?

জবাবে 'ওয়ালাইকুম' বলা যাবে

উত্তর : অমুসলিমদের সালামের উত্তর প্রসঙ্গে কোনো কোনো ফিকাহবিদদের মত হচ্ছে, যদি তারা আসসালামু আলাইকুম বলে তবে তাদের সালামের জবাবে বলতে হবে 'ওয়ালাইকুম'। তারা তাদের মতের উৎস হিসেবে সহীহ মুসলিমের তৃতীয় খণ্ডের 'সালাম' অধ্যায়ের ৫৩৮০ থেকে ৫৩৯০ পর্যন্ত ১১টি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যেখানে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত আছে। প্রথম দিককার হাদিসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদি ইহুদিরা বলে আসসামু আলাইকুম অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক। তখন তাদের জবাবে হযরত মুহাম্মদ (স) বলতে বলেছেন, ওয়ালাইকুম অর্থাৎ আপনাদের ক্ষেত্রেও সেটাই হোক। অর্থাৎ যদি কোনো মুসলিম জেনেশুনে আপনার অকল্যাণ কামনা করে আসসামু আলাইকুম বলে, আপনি তাদের বলবেন ওয়ালাইকুম অর্থাৎ আপনারও তাই হোক। ঐ বিশেষজ্ঞগণের অভিমতও এই।

তবে, কুরআনের সূরা নিসার ৮৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'যখন কেউ তোমাদেরকে সম্মানের সাথে সালাম দেয়, তখন তার চেয়ে আরও ভালোভাবে এর জবাব দাও। অথবা, কমপক্ষে ঐ ভাবেই দাও (যেভাবে সে দিয়েছে)। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের হিসাব নিয়ে থাকেন।'

সুতরাং কুরআনের এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোনো অমুসলিমের অভিবাদনের জবাবে অনুরূপভাবে বা তার চেয়ে আরও উত্তমভাবে অভিবাদন জানানো যাবে।

এখন অমুসলিমদের সালাম প্রদান সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য জেনে নেয়া যাক। পবিত্র কুরআনের সূরা মারিয়ামে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ) তাঁর মুশরিক বাবাকে সালাম দেন এবং আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا .

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, আপনাকে সালাম। আমার রবের নিকট আপনার জন্য গুনাহ মাফ চাইব। আমার রব আমার ওপর বড়ই মেহেরবান।

সূরা ত্বোয়া হার ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে,

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .

অর্থ : অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল : আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসলাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি।

আয়াতের এ নির্দেশনা অনুসরণ করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স)ও অমুসলিমদের কাছে লিখিত চিঠিতে লিখিয়েছিলেন যে, শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে। আর সূরা ফুরকানের ৬৩ তম আয়াতে বলা হয়েছে,

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا .

অর্থ : রহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা জমিনের বুকে নম্র হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দেয় (বিদায় করে)।

সূরা কাসাসের ৫৫ নং আয়াতে আছে,

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ .

অর্থ : যখন তারা (মুসলিম) কোনো বাজে কথা শোনে, তখন একথা বলে তা থেকে সরে যায়, আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের মধ্যে শামিল হতে চাই না।

অর্থাৎ, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে কুরআন তাদেরকেও সালাম দিতে বলছে। সুতরাং অমুসলিমদের সালাম দিলে কোনো সমস্যা নেই। তাফসীর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের মতে, সালাম একটা অভিবাদন এবং তা অমুসলিমদেরও দেয়া যেতে পারে। সালাম যৌজন্যতারও বহিঃপ্রকাশ।

পূর্বোক্ত সূরা মারইয়ামের ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম কুরতুবী তাবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এখানে সালাম শব্দের অর্থ হলো শান্তি। সুতরাং মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের সালাম দেয়ার অনুমতি আছে। এছাড়া

banglainternet.com

আরো অনেক তাফসীরকার অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কুরতুবীর বরাত দিয়ে উয়াইনা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূরা মুমতাহিনার ৮ নং ও ৪ নং আয়াতের উল্লেখ করেছেন। সূরা মুমতাহিনার ৮ নং আয়াতে আছে,

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ـ

অর্থ ঃ যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।

সূরা মারইয়ামের ৪ নং আয়াত মতে, 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে এক সুন্দর আদর্শ আছে।'

সূরা মুমতাহিনা ও সূরা মারইয়ামের বক্তব্য থেকে ওয়াইনার তাফসির অনুযায়ী, হযরত ইবরাহীম (আ) যদি তার মুশরিক পিতাকে সালাম দিতে পারেন তাহলে মুসলিমদেরও এ অনুমতি আছে যে তারা অমুসলিমদের সালাম দেবে।

ইবনে মাসউদ (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, অমুসলিমদের সালাম দিয়ে অভিবাদন জানানো যায় কিনা? তিনি উত্তরে এ সম্পর্কে বলেছিলেন : হ্যাঁ। তিনি নিজে তাঁর অমুসলিম সঙ্গীদের সালাম দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। অনুরূপভাবে আবু উসামাও (রা) অমুসলিমদের সালাম দিতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষজ্ঞদের এক অংশের যুক্তি অনুযায়ী সালাম দেয়া যাবে। আমি বিশেষজ্ঞদের এই অংশের সাথে একমত। অর্থাৎ আপনি অমুসলিমদের সালাম দিতে পারবেন এবং অমুসলিমদের সালামের জবাবও অনুরূপ বা তার চেয়েও সুন্দরভাবে দিতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমরা জানি, টাই খ্রিষ্টানদের প্রতীক। মুসলমানদের জন্য টাই পরার অনুমতি আছে কি?

টাই পরা নাজায়েয নয়

উত্তর : অনেক মুসলিম আছে যাদের ধারনা টাই হলো ক্রুসের প্রতীক। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পাঠে জানা যায়, খ্রিষ্টানদের কোনো ধর্মগ্রন্থেই টাইকে ক্রুসের প্রতীক বলা হয়নি। হাদিস অনুসারে মুসলমানরা এমন কোনো পোশাক পরতে পারবে না যে পোশাক অমুসলিমদের কোনো বিশেষ প্রতীকের মতো হয়। অধিকন্তু বাইবেলে কোথাও টাই ক্রুসের প্রতীক এমনটা বলা নেই। বরং এটি একটি সাংস্কৃতিক পোশাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতপ্রধান দেশের লোকেরা তাদের পোশাক আটকে রাখতে টাই পরে এবং সেখান থেকেই টাইয়ের উদ্ভব হয়।

এক দল মুসলিম আছেন যারা পশ্চিমা সংস্কৃতি পছন্দ করেন না এবং পশ্চিমাদের সবকিছুতেই প্রতিবাদ করেন। তবে আমার মতে, আমাদের উচিত পশ্চিমাদের যে কাজগুলো খারাপ সেগুলোকে বর্জন করা এবং যেগুলো ভালো সেগুলো গ্রহণ করা। যেগুলো খারাপ সেগুলোর প্রতিবাদ করার দরকার নেই। কেউ যদি প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে পারে টাই ক্রুসের প্রতীক, তাহলে সেটা পরিধান থেকে বিরত থাকবেন। শরিয়ত মুসলমানদের এ অনুমতি দিয়েছে যে, মুসলিমরা সেসব পোশাক পরতে পারবে যা শরিয়তের সীমার বাইরে যায় না। কিন্তু যেগুলো ইসলামি শরিয়তের বিপরীতে যায় সেগুলো পরা যাবে না। যেমন ঃ হাফপ্যান্ট, শর্টস ইত্যাদি। এগুলো যদিও পশ্চিমা সংস্কৃতির পোশাক কিন্তু শরিয়তের সীমালঙ্ঘন হওয়ায় এগুলো পরিধানের অনুমতি নেই। সুতরাং টাই পরা যাবে। কারণ এটা খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক নয়।

প্রশ্ন : কিছু মুসলমান আছে, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজ (যেমন ঃ ঘুষ দেয়া, ঠকানো, মিথ্যা বলা) করে থাকে। কেউ কেউ এ অজুহাতে মাথায় টুপি পরেন না এবং মুখে দাড়ি রাখেন না। তাদের যুক্তি হলো এক্ষত্রে তাদের যদি মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যায় তাহলে ইসলামেরই বদনাম হবে। এসব ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

লেবেলের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে

উত্তর : বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে দু'ধরনের মানুষ দেখা যায়। একদল হতাশাবাদী এবং আরেক দল আশাবাদী। হতাশাবাদীরা সবসময় নেতিবাচক চিন্তা করে। তারা ইসলামের লেবেল পরতে চায় না এই ভেবে যে, হয়ত কোনো সময় তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে, যেমন-- ঘুষ খাওয়া, কাউকে ঠকানো, মিথ্যা বলা; কারণ তারা ইসলামের বদনাম ছড়াতে চায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইসলামি লেবেল লাগানোর কারণে কোনো ব্যক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের লেবেলের দিকে খেয়াল করে উক্ত অনৈসলামিক কাজ থেকে বিরত থাকবে। ফলে সে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো উপকার থেকে হয়তো বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু পরকালে এর বিনিময়ে পুরস্কার পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ ঃ সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। মিথ্যার বিতাড়ন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত। যেসব ব্যক্তি আশংকা করেন যে, তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে এবং এ অবস্থায় তাদের ইসলামি লেবেল থাকলে ইসলামেরই বদনাম হবে, তাদের উচিত হতাশাবাদী না হয়ে আশাবাদী হওয়া। সেক্ষেত্রে তারা আরও ভালো মুসলিম হতে পারবেন।

banglainternet.com

প্রশ্ন : প্রায়ই দেখা যায় যেসব মুসলিম দাড়ি রাখে ও টুপি পরে তাদেরকে হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বীরা অন্যভাবে দেখে। ফলে দাড়ি না রাখলে এবং টুপি না পরলে তাদের সাথে মেশা এবং তাদের ইসলাম বুঝানো সহজ হয়। আমি জানতে চাই, ইসলাম প্রচারের জন্য মাথায় টুপি এবং দাড়ি কি বাদ দিতে পারি?

দাওয়াত দিতে হবে হিকমতের সাথে

উত্তর : সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

অর্থ ঃ আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়।

সুতরাং ইসলামের দাওয়াত হিকমতের সাথে উপস্থাপন করা গেলে টুপি এবং দাড়ি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। বরং টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে অমুসলিমদের কাছে দাওয়াত দেয়া সহজ হয়। টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে দাওয়াত পেশ করা কঠিন হয়– এ ধরনের চিন্তাভাবনা ভুল এবং এটি হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে। যদি কেউ মানে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে তার মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পাওয়ার কথা নয়। একদিকে আপনি নিজেই ইসলামের লেবেলগুলো ধারণ করছেন না, অর্থাৎ নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে সংকোচ করছেন, অন্যদিকে সেই ইসলামের দিকেই মানুষকে ডাকছেন। এধরনের কাজ প্রতারণার শামিল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন বৃদ্ধ লোক, যার এক পা কবরে চলে গেছে। এখন সে যদি বলে তার কাছে যাদুর পানি আছে আর এই পানি পান করলে শক্তি বাড়বে, আয়ু বেড়ে একশত বছর বেশি বাঁচা যাবে এবং এই দাবির মাধ্যমে সে যদি প্রতি বোতল পানি একশ টাকা দরে বিক্রি করতে চায়, তাহলে আপনি কি সেই পানি কিনবেন? কখনোই না। কারণ এ প্রস্তাবের সাথে সাথেই প্রশ্ন জাগবে, ঐ যাদুর পানিতে যদি এতই শক্তি থাকে তাহলে তিনি-ই বা কেন আগে এটা গ্রহণ করছেন না? সুতরাং লোকটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলছে এটা যে কেউ বুঝতে পারবে।

অতএব, কোনো মুসলিম যদি দাড়ি না রাখে এবং টুপি না পরে কিন্তু ইসলামের পক্ষে কথা বলে, তাহলে তো সে বরং ঐ অমুসলিমদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই সত্য বলে মেনে নিল। বরং সে একধরনের প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিল।

মাথায় টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে নিশ্চয়ই মানুষের স্বভাব বদলায় না তাই টুপি-দাড়িকে শর্ত না করাই ভালো। সুতরাং আপনি দাড়ি রাখুন ও মাথায় টুপি দিন এবং হিকমত অবলম্বন করে দাওয়াত দিন, এতে আপনার কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : হিন্দু কেউ মৃত্যুবরণ করলে কি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলা যাবে?

যে কোনো দুর্ঘটনায় এ দোয়া পড়া যায়

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন কুরআনের একটি আয়াত। এর অর্থ 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছি এবং তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।' মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিমদের জন্যও একথাটা সমান প্রযোজ্য। অমুসলিমরাও আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে এবং তাদেরকেও তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এমনকি সে যদি মুশরিকও হয় তাহলে এই আয়াত তার জন্যেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং অমুসলিম কেউ মৃত্যুবরণ করলে এই দোয়াটা পড়া যাবে। তবে কোনো মুশরিক মারা গেলে তাদের জন্য এই বলে দোয়া করা যাবে না যে, 'ও আল্লাহ! তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দাও।' পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। সুতরাং কেউ মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। তবে কেউ যদি মুশরিক থেকে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে মারা যায় তাহলে ভিন্ন কথা।

অনেকের ধারণা, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' কেবল কেউ মারা গেলেই পড়তে হয়। এটা একটা ভুল ধারণা। বরং যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই এ দোয়াটা পড়া যেতে পারে। যেমন ঃ কেউ যদি দুর্ঘটনার শিকার হয় তখনও এই দুআ পড়া যাবে। বরঞ্চ তখন এ দোয়া পড়া উত্তম।

প্রশ্ন : কতিপয় মুসলিম মেয়ে আছে যারা বাসা থেকে বোরকা পরে বের হয় এবং কলেজের গেটে এসে খুলে ফেলে। তারা জিন্স, টিশার্ট ইত্যাদি পরে থাকে। তারা ছেলেদের সাথে খোলামেলা মেলামেশা করে। এজন্য তাদেরকে বলা হয় বদ চরিত্রের মেয়ে। আর তাই কিছু লোক ভাবে যে, যারা বোরকা পরে তারা খারাপ চরিত্রের মেয়ে। এ কারণে যারা প্রকৃতপক্ষেই বোরকা পরে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও এমন কিছু মেয়ে আছে যারা অমুসলিম, কিন্তু তারা বোরকা পরে বয়ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। এ ধরনের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

ব্যক্তির উদ্দেশ্য দিয়ে বস্তুর বিচার ঠিক নয়

উত্তর : সামনে মাহাররম তথা পরপুরুষের সামনে হিজাব পালন করা ফরজ। প্রতিটি মুসলিম মেয়ের জন্যই ফরজ। হিজাব যদি কোনো মেয়ে বোরকা পরে এমন কলেজে যায় যেখানে শুধু মেয়েরাই লেখাপড়া করে অর্থাৎ মহিলা কলেজ,

banglainternet.com

সেক্ষেত্রে তারা কলেজের ভেতরে গিয়ে বোরকা খুলে রাখতে পারে। তবে যেসব কলেজে সহশিক্ষা চলে অর্থাৎ যেখানে ছেলে ও মেয়েরা একসাথে পড়ালেখা করে সেসব কলেজে এ ধরনের কাজ অনুমোদিত নয়। যদি কেউ এ ধরনের কাজ করে তার মানে এ নয় যে বোরকাটাই সমস্যা বরং সমস্যা হচ্ছে বোরকা পরিহিতার। সুতরাং এ ধরনের কাজ করলে কোনো মুসলিম নারীই আর বোরকা পরবে না এ ধরনের চিন্তাভাবনা অযৌক্তিক।

প্রত্যেক সমাজের ভেতরে কিছু খারাপ মানুষ থাকে, এদের দেখে কেউ যদি ভাবে যে, এরা বোরকা পরেও খারাপ কাজ করছে, অতএব আমি বোরকাই পরব না, এ ধরনের সিদ্ধান্ত হবে একেবারেই ভুল নির্বুদ্ধিতা যেমন– একজন ব্যক্তি গাড়ির দোকানে গিয়েছে গাড়ি ক্রয় করতে। সে মার্সিডিজ বেঞ্জ-এর সর্বশেষ মডেলের একটি গাড়ি দেখে গাড়িটি পরীক্ষা করতে চাইল এবং এমন একজন ড্রাইভারকে গাড়িটির ড্রাইভিং সিটে বসালো যে গাড়ি চালাতে জানে না। এ অবস্থায় ঐ গাড়িটি যদি না চলে, তাহলে কি গাড়ির দোষ হবে, নাকি ড্রাইভারের?

সুতরাং কেউ যদি বলে, আমি বোরকা পরব না, কারণ বোরকা পরিহিত কিছু মেয়ে ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে এবং সুযোগ সুবিধা নেয়; এটা হবে গাড়ী না চালাতে পারার কারণে মার্সিডিজ বেঞ্জ বাজে গাড়ী বলার সমতুল্য। হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল, সে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তাই বলে কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে ঘৃণা করব? কখনোই না। কারণ সে একজন খারাপ দৃষ্টান্ত। সুতরাং যদি কোনো মেয়ে এই কাজ করে, সেক্ষেত্রে অন্য মেয়েদের উচিত হবে, এভাবে চিন্তা করা যে, কিছু মেয়ে আছে যারা বোরকা পরে ইসলামের নামে বদনাম ছড়াচ্ছে, সেহেতু আমরাও বোরকা পরব এবং প্রমাণ করে দেব যে, মুসলিম মহিলারা ভালো।

যেসব মেয়েরা না জানার কারণে এ ধরনের আচরণ করছে এবং যাদের চারিত্রিক দুর্বলতা আছে আমরা তাদের জানাবো এবং হিকমাত সহকারে তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করব।

কতিপয় অমুসলিম আছে যারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে বোরকা পরে তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা উচিত। তারা অনৈতিক কাজ করার জন্য যদি বোরকা পরে তাহলে আমরা তাদের বুঝাতে পারি যে তাদের নিয়ত ভুল এবং বোরকার উদ্দেশ্য হলো শালীনতা বজায় রাখা। কিন্তু তাদের তো এ কথা বলতে পারি না যে বোরকা পরা ভুল। আর মানুষদের কাছে হিজাব পালনের প্রয়োজনিয়তা ও কারণ সম্পর্কে প্রচার করা উচিত।

প্রশ্ন : ইসলামে ধূমপান এবং পান খাওয়া অনুমোদিত কি না?

ধূমপান ও তামাকযুক্ত পান অনুমোদিত নয়

উত্তর : ইসলামে ধূমপান অনুমোদিত কি-না এ ব্যাপারে ফিকহবিদরা বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলিমরা সে সময়ের জ্ঞানের আলোকে বলেছিলেন, এটা মাকরূহ। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিশেষজ্ঞদের মতামতটাও পরিবর্তিত হয়েছে। কেননা সূরা বাকারার ১৯৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর ১০ লাখের বেশি মানুষ ধূমপানের কারণে অকালে মৃত্যুবরণ করে। যারা ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করে, তাদের মধ্যে ৯০% হলে ধূমপায়ী। আর ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যুবরণকারীর মধ্যে ৭০% এবং হৃদরোগের কারণে মৃত্যুবরণকারীর মধ্যে ২০% মানুষই ধূমপায়ী। এ ধূমপান ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সিগারেটের মধ্যে থাকে ক্ষতিকর নিকোটিন। সিগারেট শুধু ধূমপায়ীর ক্ষতি করে না বরং তার প্রতিবেশীরও ক্ষতি করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, চেইন স্মোকারদের স্ত্রীদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ সরাসরি ধূমপান যেমন ক্ষতিকর তেমনি পরোক্ষভাবে ধোঁয়া গ্রহণ আরও বেশি ক্ষতিকর। প্যাসিভ স্মোকিং-এ ধূমপায়ীর ধোঁয়াটা আরেকজনের ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ধূমপান করলে ধূমপায়ীর ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি, আঙ্গুল কালো হয়ে যাবে। গলায় ঘা হবে, পেপটিক আলসার হবে, কোষ্ঠকাঠিন্য হবে, যৌনশক্তি কমে যাবে, ক্ষুধা মন্দা দেখা দেবে এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। এমনকি স্মৃতি-শক্তিও কমে যাবে। এসব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে আলেমরা ৪০০-এর বেশি ফতোয়া দিয়েছেন যে, ধূমপান করা হারাম। তাই, এটা কারও ভালো লাগুক বা না লাগুক, ইসলামে ধূমপানের অনুমতি নেই।

banglainternet.com

এবার পান খাওয়ার ব্যাপারে কথা হলো, পানে তামাক থাকলে তা হারাম এবং তামাক না থাকলে খাওয়ার অনুমতি আছে। অর্থাৎ ইসলামে যেকোনো পদ্ধতিতে তামাক সেবন নিষিদ্ধ।

Contents

প্রশ্ন : হাদীস থেকে জানা যায়, নবী (স) এর দাড়ি এক মুঠোর চেয়ে একটু বড় ছিল। প্রশ্ন হলো, দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?

দাড়ি রাখুন গোঁফ ছাটুন

উত্তর : আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) নির্দেশ দিয়েছেন পৌত্তলিকরা তথা মুশরিকরা যা করে তার বিপরীত কাজ কর। মুখে দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট কর। নবীজির এই নির্দেশ বিস্তারিত জানা যায়, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীদের জীবনী থেকে। বুখারী শরীফের ৭ নং খণ্ডের 'পোশাক' অধ্যায়ে (৬০ নং অধ্যায়) ৭৮০ নং হাদীসে বলা হয়েছে, ইবনে ওমর (রা)-থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, পৌত্তলিকরা যা করে তার বিপরীত কর, মুখে দাড়ি রাখ আর গোঁফকে ছোট করে রাখ।'

এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, ইবনে ওমর (রা) হজ্জ ও ওমরার পরে হাতের মুঠো দিয়ে দাড়ি ধরে নিচের অংশটুকু কেটে ফেলতেন। আর সাহাবিগণই জানতেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাচ্ছেন। সুতরাং কেউ সাহাবিগণকে অনুসরণ করেন সেটা উত্তম।

এখান থেকে জানা গেল যে, দাড়ি বড় করলেও একটা সীমা আছে। আর তা হলো মুঠোর নিচেরটুকু কেটে ফেলতে হবে। এমন দশটিরও বেশি হাদীস আছে, যেখানে বলা আছে যে, সাহাবিগণ এভাবে দাড়ি রাখতেন।

বুখারী শরীফের 'পোশাক' অধ্যায়ের এসব হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম, দাড়ি রাখা ফরজ। এরপর অধিক তাকওয়া অর্জন করতে চাইলে সাহাবীদের অনুসরণে দাড়ি রাখতে হবে। এছাড়াও গোঁফ ছোট করতে হবে। সহীহ হাদীসের গ্রন্থাবলি অনুসারে সাহাবীরা এমনভাবে গোঁফ ছোট করতেন যেন ওপরের ঠোঁটের চামড়া দেখা যায়। তাকওয়া বেশি অর্জন করতে চাইলে আরও ছোট করা যাবে। আর গোঁফ বড় করলে কোনো কিছু খাওয়া বা পান করার সময় গোঁফে লাগতে পারে, যেটা অস্বাস্থ্যকর। অতএব, প্রথমে মুখে দাড়ি রাখতে হবে এবং গোঁফ ছোট করতে হবে।

প্রশ্ন : বাবা, ভাই বা স্বামীর পক্ষে এ অনুমতি আছে কি যে, তিনি মেয়ে, বোন বা স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধ্য করবেন, যদি তারা পর্দা করতে না চায়?

সীমার মধ্যে বাধ্য করা যাবে

banglainternet.com

উত্তর : প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব শুরুতে আপনজনদের মধ্যে ইসলাহ বা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো। শুরুতে হিকমাহ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে, কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে, হিজাব পালন করা উচিত।

এ পদ্ধতিতে যদি কাজ না হয়, বাধ্য বা জোর করা যেতে পারে। যেমন : পিতা কন্যাকে বলতে পারে যে, হিজাব না পরলে কলেজে যাওয়ার টাকা দেব না। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে বাধ্য করা যেতে পারে।

ফরয কাজের ব্যাপারে জোর করার অনুমতি আছে। তবে এক্ষেত্রে সীমাও আছে। যেমন– নামাজ পড়া ফরজ। এ ব্যাপারে সীমার মধ্যে থেকে জোর খাটানো যেতে পারে। হিজাবের ব্যাপারেও স্বামী স্ত্রীকে বলতে পারে যে, আমি তোমাকে ওটা দেব না কারণ তুমি হিজাব পালন কর না। তবে বাধ্য করার পূর্বে অবশ্যই হিকমত ও সদুপদেশ দিয়ে বুঝাতে হবে। এরপরও কাজ না হলে সীমার মধ্যে থেকে বাধ্য করার অনুমতি আছে।

অনেকের ধারণা, স্বামী শুধু স্ত্রীর ব্যাপারে জোর খাটাতে পারে। স্ত্রী স্বামীর ওপর জোর খাটাতে পারবে না। স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীদের ওপর জোর প্রয়োগ করা যেন তারা আদর্শ মুসলিম হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একজন ভুল পথে থাকলে অপরজনের সে ভুলটা শোধরাতে হবে। কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ..

অর্থ : তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।

অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের পোশাক বা পরিচ্ছদের মতো। তাই এটা দেখতে হবে যেন দু'জনেই সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকে।

প্রশ্ন : টুপি পরা ও দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

দাড়ি-টুপি ইনফেকশনের ঝুঁকি কমায়

উত্তর : টুপি আমাদেরকে সানবার্ন থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও টুপি পড়লে শিশির বা বৃষ্টির পানি আপনার মাথায় পরবে না; এতে আপনি ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবেন।

দাড়ির উপকারিতা হলো, যারা দাড়ি রাখে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। যেমন– ফুসফুসের ইনফেকশন, গলার ঘা ইত্যাদি। তবে দাড়ি রাখলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সুতরাং যে দাড়ি রাখে এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে গিয়ে পাঁচ বার ওযু করে তাদের শরীরের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়াও দাড়ি রাখলে মুখের চামড়ায় ক্যান্সার হয় না।

প্রশ্ন : প্যান্ট গোড়ালির উপরে পরা কি আবশ্যক? আর এটা কি একটা লেবেল?

হাদীসের আলোকে অত্যাবশ্যক

উত্তর : সহীহ বুখারীর ৭নং খণ্ডের 'পোশাক' অধ্যায়ের (৪র্থ অধ্যায়) ৬৭৮ নং হাদীসে উল্লেখ আছে, 'আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, পুরুষদের প্যান্টের যে অংশ গোড়ালির নিচে ঝুলানো থাকে, সে অংশটা দোযখে যাবে।' এছাড়া একই গ্রন্থের ৫নং অধ্যায়ের ৬৭৯-৬৮৩ পর্যন্ত হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করে, যার প্যান্ট টাখনুর নিচে মাটিতে ঝুলানো থাকে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেবেন।

সুতরাং আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা অনুযায়ী গোড়ালির নিচে যায় এমন প্যান্ট পরা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হলো এটা লেবেল কি-না? উত্তর হলো, এটা লেবেলের-ই অংশ। তবে তা টুপি অথবা দাড়ির মতো স্পষ্ট লেবেল নয়, কারণ প্যান্টের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি না। সুতরাং যাদের খোদাভীতি বেশি এবং যারা নবী করীম (স) এর অনুসরণ করতে চান, তাদের উচিত গোড়ালির উপরে প্যান্ট পরিধান করা।

প্রশ্ন : অমুসলিমদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার নাম পরিবর্তন কি বাধ্যতামূলক?

নামের শিরকের উপাদান বদলানো আবশ্যক

উত্তর : আমরা জানি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও পদবী বদলাতে বলেননি। কারণ পদবীতে তাদের বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সে কোন এলাকা থেকে এসেছে সে সম্পর্কে জানা যায়। আর নামের ক্ষেত্রে, নামের প্রথম অংশে যদি শিরক করার মতো কিছু থাকে তাহলে তার নামটা বদলানো উচিত। যেমন- কারও নাম রাম বা লক্ষ্মণ। এ নামের দেবতাগুলোকে অমুসলিমরা পূজা করে। এর মধ্যে শিরকের উপাদান আছে। সুতরাং এ নামগুলো থাকলে তা বদলানো উচিত। এ শর্ত ছাড়া পূর্ববর্তী নামটা রাখা যেতে পারে আবার বদলানোও যেতে পারে।

আমাদের নবী কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাম বদলাননি কিন্তু নামে শিরকের উপাদান থাকলে তা বদলে দিয়েছেন। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রার নাম ছিল আবদে শামস ও আব্দুল উয্যা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন আব্দুর রহমান। আসওয়াদ নাম বদলিয়ে রাখেন আবদুল্লাহ। অনুরূপ- আবুল হারেস, বাররা আছিয়াহ নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দিলেন। সুতরাং মুসলমান হলে ইসলামি নাম রাখা আবশ্যক।

মিডিয়া ও ইসলাম

প্রশ্ন : আপনি একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন- "তোমরা আমার কোনো প্রতিমা তৈরি করবে না। এমন রূপক বানাবে না যেটি আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর উপরে কিংবা পাতালে। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ।" আপনার কি খুব হাস্যকর মনে হয় না যে, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিহিংসা আছে; অথবা তিনি ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন? আমার ধারণা ছিল এই অনুভূতিগুলো শুধু আদম সন্তানেরই থাকে। ঈশ্বর হিংসা করছেন, ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন, তা আমার মনে হয় না।

ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত হন না

উত্তর : প্রশ্নটি বেশ সুন্দর। এ বিষয়ে আমিও একমত। এই কথাটি বলা আছে বাইবেলে। ঈশ্বর কেনো হিংসা করবেন?

আবার আপনার হয়তো মনে হতে পারে, আমরা ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরীক করবো না। তা হলে ঈশ্বর রেগে যাবেন।

এখানে প্রশ্ন হয়েছে উদ্ধৃতি নিয়ে, আমি একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল, "তোমরা আমার এমন কোন প্রতিকৃতি তৈরি করবে না যা আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর উপরে কিংবা পৃথিবীর নিচে। তোমরা এমন কারো উপাসনাও করবে না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু ঈশ্বর এবং খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।" কিন্তু এ কথাটি আছে 'ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অব অক্সোডাজ', অধ্যায়-২০, ৩ থেকে ৫ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে। তাছাড়া বুক অব ডিওটরনমী, অধ্যায়-৫, অনুচ্ছেদ ৭-৯ এ একথার উল্লেখ রয়েছে আর এটি বাইবেলের একটি উদ্ধৃতি।

আমি এ কথা বলি না যে এর পুরোটাই ঈশ্বরের বাণী। এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশের সাথে আমি আপনার সাথে একমত যেখানে বলা হয়েছে 'ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ'- আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। তাই এই প্রশ্নটি একজন খ্রিস্টানকে করবেন। আমি বাইবেলের সবকিছু সমর্থন করি না। যদি কুরআনের সাথে মিল থাকে তাহলে সমর্থন করি; কিন্তু মিল না থাকলে সমর্থন করি না। তাই আমি এখানে আপনার সাথে একমত যে, ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত হন না।

banglainternet.com

প্রশ্ন : মুসলমানরা মানবজাতির আশীর্বাদ। কিন্তু অমুসলিমদের কী হবে যারা জন্ম থেকেই অমুসলিম? জীবনের কোন্ পর্যায়ে তারা ইসলামকে বুঝবে?

মানুষ মুসলিম হয়ে জন্ম নেয়

উত্তর : আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'প্রত্যেক শিশুই দ্বীন-উল-ফিতর' নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। 'দ্বীন-উল-ফিতর' অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশুই মুসলিম হয়ে জন্মায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে প্রভাবিত হয় মা, বাবা, গুরুজন, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ দ্বারা। তারপর তারা শুরু করে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা এবং এভাবেই সে অমুসলিম হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক শিশুই ইসলাম অনুযায়ী মুসলিম হয়ে জন্মায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য। পরবর্তীতে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তাই যখন কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তখন শব্দটি আসলে 'কনভার্ট' হবে না। কনভার্ট হলো এক আবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা; এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে সমর্পিত হওয়া। কিন্তু এখানে সঠিক শব্দটি হবে 'রিভার্ট' অর্থাৎ রিভার্ট শব্দটি ব্যবহৃত হবে সেই মানুষটির ক্ষেত্রে যিনি গোড়াতেই মুসলিম ছিলেন বা মুসলিম হিসেবে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে অমুসলিম হয়েছিলেন এবং আবারও ইসলামে ফিরে এসেছেন। আর এ জন্যই কনভার্টেড মুসলিম এর পরিবর্তে রিভার্টেড মুসলিম বলা উচিত। কারণ প্রত্যেক মানুষই জন্মায় নিষ্পাপ হয়ে কিন্তু পরবর্তীতে সে ভুল পথে চলে যায়।

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যারা অমুসলিম হয়ে যায়, তারা কিন্তু অমুসলিম হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেক মানুষই মুসলিম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তারা তাদের বাবা, মা অথবা পরিবেশের কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তারা জীবনে কখন ইসলামকে বুঝতে পারবে? একেক সময়ে একেক মানুষ এটি বুঝতে পারবে। যেমন– যে মুসলিম পরিবারে জন্মায় সে হয়তো জীবনের প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারবে। আবার মুসলিম পরিবারে জন্মানোর পরও অনেকে সেটি বুঝতে পারে না এবং পরে হয়তো বুঝতে সক্ষম হবে। কেউ হয়তো প্রথম দিন থেকেই বুঝবে আবার কেউ ১ বছর , ২ বছর কিংবা ৫ বছর বা ১০ বছর পর বুঝতে পারে। তবে কতদিন লাগবে সেটি আপনিই ভালো জানেন।

কিছু লোক অমুসলিম পরিবারে জন্মায়, সেখানে সে বড় হয়, তারা হয়তো একেবারে ছোটবেলায় বুঝবে কিংবা স্কুলে পড়ার সময় অথবা কলেজে পড়ার সময়ও বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একেকজন মানুষ একেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বুঝে থাকে ; কোনো মুসলিম সেই অমুসলিমকে বোঝাক বা না বোঝাক আল্লাহ

পবিত্র কুরআনে সূরা হা-মীম সিজদা ৫৩ নং আয়াত–এ বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য আমার নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবো। নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবো এই বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হবে এটাই সত্যি।"

তাহলে কোনো মুসলিম অমুসলিমদের না বোঝালেও 'তিনি (আল্লাহ) নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবেন এই বিশ্বজগতে যতক্ষণ না সেটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হবে।'

যদি কোনো কথা আমি তাদের বলি তারা হয়তো নাও বুঝতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যখন বলেন সেটা নিশ্চিত করেন, সেটা তারা অর্থাৎ অমুসলিমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। এটাই হচ্ছে হক্ব। কিন্তু পরবর্তীতে এই সত্যটি জানার পরে সে হয়তো মানবে কিংবা মানবে না– সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। ব্যক্তিগত কারণে সে স্বীকার করতে পারে– আবার নাও স্বীকার করতে পারে। কিন্তু সে মারা যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহ তাকে নিদর্শন দেখাবেন। কিন্তু কবে কখন সেটি আল্লাহই ভালো জানেন। মৃত্যুর পূর্বে এবং রোজ কিয়ামতের দিন যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহর কাছে কোনো অভিযোগ করতে পারবে না যে, সে কোনো নিদর্শন পায়নি। তাই এটাও বলতে পারবে না কেনো তাকে জাহান্নামে পাঠানো হচ্ছে? তারা শুধু বলবে আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা ভুল করেছি। কারণ তারা জানে যে তারা নিদর্শন দেখেছে কিন্তু গ্রহণ করেনি। তারা তখন আরজ করবে তাদের আরেকবার সুযোগ দেয়া হোক। কিন্তু তখন আল্লাহ বলবেন, " তোমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। যাহোক মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তাদেরকে নিদর্শন দেখাবেন।

প্রশ্ন : মুসলিমদের মধ্যে কিছু কুলাঙ্গার আছে, তারা খারাপ কাজ করে থাকে এবং মিডিয়াও তাদের তুলে ধরে। এই সব মুসলিমরা কি ধর্মের নামে খারাপ কাজ করে মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? এবং এতে অমুসলিমরাও কী ভুল বুঝছে না?

প্রকৃত মুসলিম ভুল কাজ করে না

তাই তারা মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না এটা নিয়ে তারা ভাবে না। কারণ তাদের তো নিজের ধর্মের দিকে কোনো খেয়ালই নেই। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়ে মোটেও চিন্তা করে না। মিডিয়া কী করছে তা নিয়েও চিন্তা করে না। কিন্তু আমি মিডিয়ার দোষ দিতে চাই। তারা কেনো অল্প কিছু মানুষকে তুলে ধরছে? যদি মুসলমানদের বেশির ভাগই এসব কাজ করতো তখন ইসলামকে অপবাদ দিলে আমি নিজেও আপত্তি করতাম না। কিন্তু মিডিয়াগুলো অল্প কিছু মানুষকে বেছে নিচ্ছে।

banglainternet.com

আপনারা জানেন, হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদিকে পুড়িয়ে মেরেছিল। তাহলে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কি আমি খ্রিস্টানদের দায়ী করবো? এই জন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দোষ দিতে পারবো? কখনোই নয়। কারণ বাইবেলের কোথাও লেখা নেই যে তোমরা ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করবে। এমন কিছু বলাটাও ভুল হবে।

তাই এ সব কুলাঙ্গারের চাইতে আমি মিডিয়াকেই বেশি দোষ দিতে চাই। প্রত্যেক ধর্ম গোত্রেই আপনারা কিছু কুলাঙ্গার খুঁজে পাবেন এবং আমি আমার অনেক আলোচনাতেই এ সব কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে বলেছি। মিডিয়ার উচিত এমন সব খবর প্রচার করা যেগুলো সত্য। মিডিয়া এ সব লোকদের দেখিয়ে বলতে চায় এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম। অথচ তারা বলতে পারত যেসকল মুসলিম চুরি করে কিংবা তাদের সংখ্যা মাত্র ১ জন, ৫ জন, ১০ জন। কেননা মুসলমানদের সংখ্যা ১.৫ শতকোটিরও বেশি। তারা সকলেই অপরাধী নয়। এভাবে বলা হলে কোনো সমস্যা হতো না। কিন্তু তারা বলতে চায় সব মুসলিমই ভুল কাজ করছে। যদি কোনো নামধারী মুসলমান মাদক নিয়ে ধরা পড়ে তাহলে মিডিয়া এমন ভাব করে যেন সব মুসলিমই মাদক নিয়ে ব্যবসায় করছে। কিন্তু মিডিয়ার উচিত সত্য প্রচার করা এবং আমিও তাই চাই।

প্রশ্ন : ইসলাম ধর্মে 'খৎনা' করা ফরয বা বাধ্যতামূলক কেনো?

খৎনা রোগ-বালাই প্রতিরোধক

উত্তর : ইসলাম খৎনাকে ফরয বলেনি, এটি হলো 'সুন্নাত'। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি করলে ভালো। এ বিধানটি হলো 'মুস্তাহাব'। অর্থাৎ, ইসলামে খৎনা দেয়া সুন্নাত, এটি 'ফরয' না। খৎনা দেয়ার অনেক কারণ আছে। আজকের বিজ্ঞান আমাদের বলে যদি কোনো লোক খৎনা করে তাহলে তার লিঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি খৎনা দেয়া না থাকে তাহলে সম্ভাবনা বেশি। কিছু রোগ আছে যেগুলো প্রতিরোধ করা যায় যদি খৎনা দেয়া থাকে।

খৎনা দেয়ার সময় লিঙ্গের উপরের ত্বকটি কেটে ফেলে দেয়া হয়। যদি খৎনা দেয়া না থাকে, তাহলে প্রস্রাবের পর তার উপরের চামড়ায় কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব থেকে যায়, যা থেকে অনেক রোগ হতে পারে। এ থেকে যেসব রোগ হতে পারে সেগুলো হলো– চুলকানি, শরীরের ত্বকে প্রদাহ, পেপলোসাইটিস প্রভৃতি। খৎনা করা থাকলে এসব রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া প্রস্রাব করার পর আমরা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলি এবং এভাবে বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করে থাকি। আজকে বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, সে লোক অধিক যৌন তৃপ্তি পাবে যার খৎনা দেয়া থাকে।

তাছাড়াও খৎনা দেয়া থাকলে ত্বকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, যার খৎনা দেয়া থাকে তার 'এইডস' রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। যদি খৎনা করা না থাকে তাহলে এইডস ভাইরাস খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খৎনা দেয়া থাকলে এ রকম আরো অনেক রোগবালাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। এ জন্যই আপনারা দেখে থাকবেন যে, আমেরিকাতে এখনকার দিনে ৫০% এর বেশি শিশুকে তার বাবা-মায়েরা খৎনা দিয়ে থাকে। যদিও তারা মুসলিম নন। এমনকি আমেরিকার খ্রিস্টান ডাক্তাররাও রোগীকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার ছেলের খৎনা দিতে চান কি না? এদের মধ্যে ৫০% -এর বেশি ছেলেদেরকে খৎনা দেয়া হয়। ইসলামি অনুশাসনে খৎনার বিধান থাকার কারণে তারা এমনটি করেন না বরং তারা জানে খৎনা করানো হলে তার ছেলেদেরই উপকার হবে।

প্রশ্ন : কীভাবে মুসলমানরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়ার সৃষ্ট ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করবে? ধরুন আমেরিকা যেভাবে পুরো পৃথিবীকে করায়ত্ব করতে চায় এবং যে সব মুসলিম তাদের ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না তারা মিডিয়ার মিথ্যা রটনাগুলো বেশি করে বিশ্বাস করে থাকে। মুসলমানদের কীভাবে এইসমস্ত ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা উচিত?

জ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে

উত্তর : এই প্রশ্নটির উত্তর বেশ জটিল। মোটেই সহজ নয়। প্রায়ই বুঝতে পারি না যে আমাদের কী করতে হবে।

তবে শুরুতে আমরা যা করতে পারি তা হলো– সবার আগে আমাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বেশিরভাগ মুসলিমই তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানে না। তাই আমরা প্রায়শই এরূপ সমস্যায় পড়ে থাকি। যদি নিজের ধর্মকে ভাল করে জানি, তবে মিডিয়া এই মিথ্যা রটনা করতে পারবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানি না। এ কারণেই আমরা লজ্জিত হই। যখন মিডিয়া বিভিন্ন খবর প্রচার করে তখন তাদের কথাগুলো মেনে নেই।

আমি একটি উদাহরণ দেই তাহলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। একবার এক ধার্মিক মুসলিম আমাকে বললেন, ভাই জাকির আপনি কি জানেন এই তালেবানরা খুবই নিষ্ঠুর ও খারাপ মানুষ? আমি বললাম, কেন? কী কারণে তাদেরকে খারাপ বলছেন? উত্তরে তিনি বললেন, কারণ তারা মহিলাদের আঘাত করে। আমি বললাম কে বলেছে? তিনি বললেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি পাল্টা জিজ্ঞেস

banglainternet.com

করলাম কোথায় দেখেছেন? তিনি জানালেন, আমি বিবিসি-তে দেখেছি। আমি এখানে তালেবানদের পক্ষে বলছি না। তারা আমার বন্ধুও নয় আবার শত্রুও নয়।

একবার মালয়েশিয়াতে লেকচার দিচ্ছিলাম। এক দম্পতি তাদের দু'জনই ডাক্তার। একজন স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ অন্যজন শিশু-রোগ। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে তারা আফগানিস্তানে ছিলেন। সেখানে তারা আহত লোকদের চিকিৎসা করছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন– "তালেবানরা এক মহিলাকে মারছে" ভিডিওটি যে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে তারা প্রকৃতপক্ষে তালেবান নয়। কৌতূহলী হয়ে আমি বললাম, আপনি কীভাবে জানলেন? তিনি বললেন, আমি তালেবানদের সাথে ছিলাম, আমি জানি তারা কীভাবে পাগড়ি বাঁধে। যেহেতু আমরা আরব নই, তাই আমরা বুঝতে পারব না পাগড়ি বাঁধার কতগুলো নিয়ম আছে আরবদের মধ্যে। তবে তারা জানে যে আরব আমিরাতে পাগড়ি বাঁধার নিয়ম একরকম, সৌদি আরবে পাগড়ি বাঁধার নিয়ম আরেক রকম এবং কুয়েতে অন্য রকম। তারা তা জানে কিন্তু আমরা তা জানি না। সেই মহিলাটি তালেবানদের সাথে ছিলেন। তাই তিনি জানেন তারা কীভাবে পাগড়ি বাঁধেন। কিন্তু ভিডিওতে দেখানো তালেবানরা সেভাবে পাগড়ি বাঁধেনি। এখানে বলতে চাচ্ছি, ভিডিওতে যে তালেবান দেখানো হয়, তারা প্রকৃত তালেবান নন। তারা নকল তালেবান।

ভিডিওতে দেখানো শুটিংটি হলিউড কিংবা অন্য যেখানেই হোক, তারা ঠিকমতো শুটিং করতে পারেনি। এভাবে মিডিয়া সব কিছু বদলে দিতে পারে। যেমন ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করলাম, জর্জ বুশ ভালো না খারাপ মানুষ? আপনি বললেন, ভালো মানুষ না। আমি এখানে 'না' শব্দটি সম্পাদনা করে মুছে দেব। তারপর আপনারা শুনবেন সে ভালো মানুষ এবং যখন আপনাকে ভিডিওটি দেখানো হবে তখন আপনি বলবেন, হয়তো মুখ দিয়ে ভালো শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। অথচ আপনি ভালো মানুষ বলেননি। আপনি বলেছেন, ভালো না কিন্তু আমি 'না' শব্দটি কেটে দিয়েছি। তারপর আপনাকে দেখালাম যে দেখেন আপনি ভালো মানুষ বলেছেন। তখন আপনি বলবেন আমি মুখ ফসকে হয়তো বলে ফেলেছি, আমি ভুল করে বলেছি।

কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনি বলেছেন ভালো মানুষ না। কিন্তু আমি 'না' কথাটি বাদ দিয়ে দিলাম। এভাবে মিডিয়া বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে থাকে। কিন্তু আমাদের মুসলিমদের যেটি করা উচিত তা হলো আমাদের নিজ ধর্মটিকে আরো অনেক ভালো করে জানা। আমাদের দ্বীন সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে এবং মিডিয়া যখন এগুলো প্রচার করবে সেগুলো শুনে আমরা কখনোই প্রভাবিত হবো না। যদি ইসলামকে বিচার করতে চান তাহলে ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থগুলোকে দেখতে হবে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদিস। একজন মুসলিম এবং মুসলিম সমাজ কী করলো সেটি দেখলে চলবে না। ইসলামকে বিচার করতে চাইলে আমরা দেখবো

না ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা আফগানিস্তানের মুসলিমরা কী করে। আমাদের ইসলামকে বিচার করতে হবে মূল ধর্মগ্রন্থগুলো দিয়ে। অর্থাৎ আল-কুরআন ও নবীজির হাদিসের আলোকে।

পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদিস দেখতে হবে, আমরা এগুলো মেনে চলবো এবং মিডিয়ার এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে আমাদের জানতে হবে কীভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। যেমন– একজন সাংবাদিক ভাই দুটি প্রশ্ন করার কথা বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন করেছেন একটি। কারণ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম, তিনি সেটা আশা করেননি। তিনি আশা করেননি যে আমি বলবো "আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত।" তিনি ভেবেছিলেন আমি দেশকে নিয়ে গর্বিত নই। আমি ভারতকে নিয়ে গর্বিত এবং ভারতবর্ষ হচ্ছে একটি যুদ্ধক্ষেত্র। আমরা হলাম মুজাহিদ, আমরা সবাই জিহাদ বা চেষ্টা করছি এবং নাম আমার নায়েক। 'নায়েক' মানে যোদ্ধা। একজন বীর। তাহলে নাম দিয়েও আমি একজন মুজাহিদ। এ যুদ্ধের ময়দানে আমাকে থাকতে হবে। আমার কাজ আমাকে করতে হবে এবং এ কারণে আমি মুম্বাইতে থাকতে চাই। কিন্তু লোকজন আমাকে অন্য জায়গায় থাকতে বলে। অনেক লোক আমাকে আবার অন্য কোনো দেশে থাকতে বলে। তারা বলে আপনার জীবনতো হুমকির মধ্যে, আপনি কেনো এই যুদ্ধের ময়দানে থাকবেন? আমি দেশকে অনেক কারণেই ভালবাসি এবং এখানেই আমার যুদ্ধ। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কারণে আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। তাই মিডিয়ার এ সমস্ত মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে আমাদের জানতে হবে টেবিলটিকে কীভাবে উল্টে দেয়া যায়।

প্রশ্ন : আমরা সবাই জানি যে উসামা বিন লাদেন যখন আফগানিস্তানে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন তখন আফগানিস্তানের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন নায়ক। আর তার অনেক বছর পরে এই নায়কই একদিন হয়ে গেলেন রাক্ষস। এটা আমরা সবাই জানি। এখন আমার কথা হলো, সাংবাদিকতার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। বিভিন্ন রিপোর্ট মানুষের সামনে তুলে ধরে কোনো উপসংহার টানা বা মন্তব্য করা উচিত না। আর পশ্চিমা মিডিয়াগুলো বিভিন্ন নিয়ম বানাচ্ছে। এবং নিজেরাই সে নিয়ম ভাঙ্গছে। এখনকার দিনে এটাই ঘটছে। তারা ইচ্ছামত নিয়ম বানাচ্ছে আর ভাঙ্গছে। আমরা মুসলিমরা কীভাবে পৃথিবীর মানুষকে এ ঘটনাগুলো জানাতে পারি? এছাড়াও পৃথিবীতে যত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে মিডিয়া বলছে এগুলোর জন্য দায়ী আল কায়েদা। আর এখন অনেক রাষ্ট্র থেকে বলা হচ্ছে যে অমুক অমুক ঘটনার জন্য দায়ী হলো আল কায়েদা। প্রশ্ন হলো, আমরা শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা কীভাবে এসব মন্তব্যের প্রতিবাদ

banglainternet.com

করতে পারি? আমি আবারও সাংবাদিকতার নিয়ম-কানুনের কথা বলছি। একটা ঘটনা ঘটছে এবং তার মন্তব্য করা হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা ও মন্তব্য দুটো আলাদা থাকা উচিত। অথচ তারা ঘটনা, মন্তব্য– এ দুটি একত্র করে আমাদেরকে দেখাচ্ছে। তারা পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায় যে ইসলাম আসলে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। এ ব্যাপারে কি কোনো হাদীস আছে, অথবা অন্য কিছু, যা আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে?

টেররিজম-জিহাদ নিয়ে অপপ্রচার

উত্তর : আমরা জানলাম যখন উসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি তখন হিরো। আর উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকাই তৈরি করেছে। পরে যখন তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে গেলেন, তখন তাকে বলা হলো সন্ত্রাসী। আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন, সাংবাদিকদের একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আর সাংবাদিকদের কোনো মন্তব্য করা উচিত নয়। সাধারণত রাজনৈতিক নেতারা এগুলো করতে পারেন, সাংবাদিকরা নয়। এটাই হচ্ছে নিয়ম। তবে ভাঙ্গার জন্যেই নিয়ম বানানো হয়। আমেরিকায় নাকি কথা বলার স্বাধীনতা আছে। আমার মতে, আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা সবচেয়ে কম। আমেরিকায় আপনি ততক্ষণ বলতে পারবেন যতক্ষণ তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগবে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু না বললে আপনি যা খুশি তাই বলতে পারবেন। তবে বিরুদ্ধে কিছু বললে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

আমার মতে, পুরো ব্যাপারটাই একটা নাটক। লোক দেখানো কথা বলার স্বাধীনতা। এবার মূল প্রশ্নে আসি। এ প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় কয়েক বছর আগে পার্থে। প্রশ্নটি করেছিলেন আমেরিকার কনসাল জেনারেল। সেখানে আমার লেকচারের ট্রপিক ছিল টেররিজম এন্ড জিহাদ। তিনি আমাকে বললেন, ভাই জাকির আপনি কি জানেন যে, উসামা বিন লাদেন একজন টেররিস্ট? এটা প্রথম প্রশ্ন। আমি তখন তাকে বললাম, উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যদি বলতে হয় প্রথমে আমি তাকে চিনি না। কখনও তাকে দেখিও নি। আমি তার বন্ধু না কিংবা তার শত্রুও নই। আমি আসলে জানি না। বিবিসি আর সিএনএন টিভি চ্যানেলের নিউজগুলো শুনে আমি এর উত্তর দিতে পারব না। কারণ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতের ৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

banglainternet.com

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۔

অর্থ : হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদিগকে অনুতপ্ত না হতে হয়।

বিবিসি, আর সিএনএন–এ যে নিউজ দেখানো হয়, সে নিউজ দেখে আমি বলতে পারব না যে, আপনার কথা ঠিক। কারণ আমি যা জানি তা হচ্ছে খবরগুলো বানানো। যদি না বুঝি যে খবরটা আসলেই সত্য ততক্ষণ পর্যন্ত এদের ওপর আস্থা রাখতে পারি না। তাছাড়া ইউহানড্রেডলি যখন আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আল কায়দা সম্পর্কে তার মতামত কী? তিনি বলেছিলেন, 'আমার সন্দেহ হয় আসলে আল কায়দা আছে কিনা।' তাহলে সিএনএন আর বিবিসিতে প্রচারিত নিউজগুলোর ওপর নির্ভর করে আমি এর উত্তর দিতে পারি না।

আল্লাহই জানেন আসল ঘটনা কী! তবে সিএনএন কে নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা। আবার তাদের চ্যানেলগুলোর মাধ্যমেই জানতে পেরেছি যে, তারা হাজার হাজার আফগানিকে হত্যা করেছে; ইরাক আক্রমণ করেছে। আর যারা এই চ্যানেলগুলোর মালিক তারাই যখন বলছে আর গর্ব করছে, তাহলে এ খবরটা নিশ্চিত।

এখন বলুন কে এক নাম্বার টেররিস্ট। আমার মতে, জর্জ বুশ। এই খবরটা পরের দিন হেড লাইনে আসল– ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি একজন মৌলবাদী আর বুশ একজন টেররিস্ট। খবরটি অস্ট্রেলিয়ার নিউজ পেপারে হেড লাইন হয়েছিল। কিছুদিন আগে আমেরিকার শিকাগোতে একটা সার্ভে করা হয়েছিল। আর সেই জরীপে টেররিস্ট হিসেবে ১. উসামা বিন লাদেন ২. সাদ্দাম হোসেন ৩. জর্জ বুশ– এই তিনজনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল বিশ্বের এক নম্বর টেরোরিস্টকে বেছে নেয়ার জন্য।

এ জরীপটি করা হয়েছিল শিকাগোর বিভিন্ন শহরের লোকজনের ওপর। আপনাদের কি মনে হয় তাদের সবাই মুসলিম? সবচেয়ে বেশি ৭৮% লোক বলেছে তাদের মধ্যে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট। কিন্তু এ মন্তব্যটি আমার নয়। তবে লোকজন আসলে এসব কথা বলতে চায় না। মানুষ এসব কথা বলতে ভয় পায়। একটা হাদিস আছে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'যদি কোনো অন্যায় হতে দেখ, হাত দিয়ে সেটা থামাও। যদি হাত দিয়ে সেটা থামাতে না পার তবে মুখ দিয়ে থামাও। যদি মুখ দিয়েও থামাতে না পার তবে তুমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। আর তখন তুমি হবে সবচেয়ে নিম্নস্তরের মুমিন।'

তাই আমি স্পষ্ট করে বলি, আমি সত্য কথা বলি। আল্লাহ কিছু মানুষকে হাত দিয়ে থামানোর ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা না থামালে আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করবেন। আল্লাহ

আমাকে অন্তত কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন। তাই আমি কথা বলে যাচ্ছি। এ কথাটা আমি ইংল্যান্ডেও বলেছি, সেখানকার পুলিশি চাপের সামনে, সেখানকার মেয়রের সামনে। এমনকি আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং মালয়েশিয়ায়ও বলেছি। তবে আমি বলেছি হিকমার সাথে। আল্লাহ আমাকে কথা বলার সামর্থ্য দিয়েছেন। যদি আমি কথা না বলি তাহলে আল্লাহ আমার এ ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। যাহোক আমি বলছি না এই জরিপটা ঠিক বা ভুল। যদিও বলা হচ্ছে ১১ই সেপ্টেম্বরের সেই দুর্ঘটনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছিল। আর কয়েকজন তো 'বুশ নিজেই এ কাজটা করিয়েছেন' বলে অভিযোগ করেছেন। এবার আমি বলি, মুসলিমরা কীভাবে জবাব দেবে আর লন্ডনে সেই ৭ জুলাই বোমা বিস্ফোরণের পর কী হয়েছিল?

আমেরিকার প্রায় বেশির ভাগ মুসলিম এক জায়গায় একত্রিত হয়ে নিন্দা করলেন। ইংল্যান্ডেও অনুরূপ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি তাদের নাম উল্লেখ করতে চাই না। আমি তাদের অনেককেই চিনি। তারা নিন্দা করলেন নিউইয়র্কে ১১ সেপ্টেম্বর যা ঘটেছে এটা হারাম, এটা ভুল। ৭ জুলাই যা লন্ডনে ঘটেছিল আমরা তার নিন্দা করছি। এতে ৫০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায়ও নিহত হয়েছে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি লোক। আমরা তার নিন্দা করছি। তারা যা বলেছে ঠিক কথাই বলেছে। আমি এ সম্পর্কে একমত। কারণ পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩২ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا .

অর্থ : এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ ব্যতীত কেউ কাকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল।

তাই আমিও এ কাজের নিন্দা করি, যেহেতু ১১ সেপ্টেম্বর তিন হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়। সেটাকে নিন্দা করাই উচিত। লন্ডনে ৫০ জনেরও বেশি লোকের মৃত্যুও নিন্দনীয়। তবে এখানেই থেমে যাওয়া যাবে না। এটাও বলতে হবে যে, আফগানিস্তানে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে সেটাও নিন্দনীয়। ইরাকে যে হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা গেছে, সেটাও নিন্দনীয়। বসনিয়ায় যে হাজারও মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, এটারও নিন্দা করব আমরা। ফিলিস্তিনে যে হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, তারও নিন্দা করতে হবে। আমরা কেন ভয় পাব? কিন্তু আমেরিকানদের প্রশ্ন করলে তারা নিন্দা করতে অস্বীকৃতি জানায়। আসলে আমেরিকা দেশটা একটু আলাদা! যদি বেশি কথা বলি তাহলে সমস্যায় পড়ে যাব।

আমার প্রশ্ন হলো, কেনো আমেরিকা তো সেই দেশ যেখানে কথা বলার স্বাধীনতা আছে। তাহলে ভয় পাবার কী আছে? মুম্বাই সম্পর্কে যারা জানেন, মুম্বাই-এর পরিবেশ পরিস্থিতি বেশি ভালো নয়, আমি তো সেখানেও লেকচার দিয়েছি।

তবে আমেরিকা, ইংল্যান্ড সেখানেও কিছু বলার স্বাধীনতা আছে। লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করে– ভাই জাকির, সেখানে কেউ আপনাকে হুমকি দেয় না? জবাবে আমি বললাম, এটা আমার নিত্যসঙ্গী। নবীজি (স) কে কি হুমকি দেয়া হতো না? আমরা তো নবীজির পথ অনুসরণ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করবেন। তবে যখন কথা বলব তখন হিকমার সাথে বলব। আমরা বলব নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিন্দনীয়। আমরা বিশ্বাস করি ১১ সেপ্টেম্বর যে তিন হাজারেরও বেশি লোক মারা গেল, সেটা অন্যায়। আমরা বলতে চাই লন্ডনে যা ঘটেছে তা অন্যায়। তবে অন্যসব অন্যায়গুলোরও প্রতিবাদ করতে হবে। যখন একজন লোক শরীরে বোমা বাঁধে, সেটার বিস্ফোরণ ঘটায়, এবং বিশ-ত্রিশজন নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলে তখন তাকে বলা হয় টেররিস্ট বা সন্ত্রাসী। তবে যখন কেউ প্লেন থেকে নিচে বোমা মারে, আর এভাবে হাজারো আফগানিকে হত্যা করে, তখন তাকে বলা হয় সাহসী আমেরিকান!

এতে সাহসের কী আছে? এটা হচ্ছে চুপিচুপি যুদ্ধ করা বা গোপন যুদ্ধ। উপর থেকে যে বোমা নিক্ষেপ করা হয় তা সাধারণ বোমার তুলনায় পঞ্চাশগুণ বেশী ধ্বংসশীল।

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইসলাম হলো সত্যের ধর্ম, শেষে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

অর্থ : বল, সত্য সমাগত এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।

প্রশ্ন : এখনকার সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়া হচ্ছে সিনেমা। এ সিনেমাগুলো বানাচ্ছে হলিউড, বলিউড, ললিউড। আর এখন সম্ভবত ডলিউড অর্থাৎ দুবাইতে নির্মাণ হচ্ছে বেশী। এ সিনেমার মাধ্যমে তাদের কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ছে পুরো পৃথিবীতে। Passion of Christ এরকম একটি সিনেমা। যেখানে বলা হয়েছে যীশুখ্রিস্টের কথা। সিনেমার ডায়ালগগুলো হিব্রুভাষায় রচিত। আমার প্রশ্ন হলো, খ্রিস্টান ধর্মে যা প্রচার করা হয় তার সাথে এর কিছুটা মিল আছে। আল কুরআনের সাথে অবশ্য কখনোই পুরোপুরি মিলবে না। তবে পৃথিবীজুড়ে দর্শকেরা এই সিনেমাটা

banglainternet.com

উপভোগ করছেন। আর এভাবেই এটা তাদের মনে গেঁথে গেছে। আমরাও কি এই মিডিয়াটিকে কাজে লাগাতে পারি না? মুসলমানরা কীভাবে এই সিনেমা মিডিয়াকে কাজে লাগাতে পারে? মানুষের মাঝে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে পারে। যেমন The Message *যে ছবিটি দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল, মুসলিম হয়েছিল!*

সিনেমার মাধ্যমেও ধর্মপ্রচার সম্ভব

উত্তর : জ্বি, সিনেমার মাধ্যমেও আমরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি। ধর্ম প্রচার করতে পারি। যেমন হলিউড, বলিউড অথবা বর্তমানের ডলিউড। ডলিউড একটি নতুন শব্দ এর অর্থ হচ্ছে দুবাই মিডিয়া সিটি। আপনি তাদের নির্মিত Passion of Christ এর কথা বলছেন। জানতে চেয়েছেন এসব সিনেমা সম্পর্কে আমার মতামত কী? আমি Passion of Christ দেখিনি। যদিও আমার এই সিনেমাটা দেখার ইচ্ছে আছে। সাধারণত আমি সিনেমা দেখি না। তবে এর উপরে রিপোর্ট পড়েছি। মেল গিবসন এই সিনেমাটা অরিজিনাল ল্যাংগুয়েজে বানিয়েছেন। এটা নিয়ে বেশ সমালোচনাও হয়েছে। আর সিনেমাটা কিছুটা ইহুদীদের বিরুদ্ধে ছিল। এসব ব্যাপারে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। তবে সিনেমাটা জনপ্রিয় হয়েছে। যেহেতু নেগেটিভ কথা বলা হয়েছে তাই সিনেমাটি বক্স অফিসে হিট করেছিল। সিনেমাটা রেকর্ড ভেঙ্গেছিল। নির্মাতা মেল গিবসন মোটা অঙ্কের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন। সেটা ফ্লপ হলে তখন তার অনেক টাকা লোকসান হতো। সিনেমাটা হিট করেছিল। কারণ সিনেমাতে অনেক সঠিক জিনিস ছিল। এর কিছু কিছু ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আবার অনেক কিছুর অমিলও ছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো The Message সিনেমা নিয়ে। আমি এটা দেখেছি। মোস্তফা আকতার ইনথুনি কুইন ছবিটির নির্মাতা। তিনি অভিনয় করেছিলেন হামযার ভূমিকায়। আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন, তার কাজ কবুল করুন। সিনেমাটা তখন বানানো হয়েছিল অনেক সুন্দরভাবে। আমি বলব যে ইসলামিক লাইনে সিনেমার মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ সিনেমা। আলহামদুলিল্লাহ। সিনেমার হিরোকে না দেখিয়ে, নবীজি মুহাম্মদ (স) কে না দেখিয়ে, তার কোনো ছবি না দেখিয়ে, তার কণ্ঠস্বর না শুনিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ- সিনেমার সব ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (স) কে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তাকে দেখানো হয়নি। আর শুনানো হয়নি তার কণ্ঠস্বর। একবার শুধু তার উট আর লাঠি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে ক্যামেরা এমন এঙ্গেলে ধরা হয়েছে যে যখন নবীজি (স) ঘুরে অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছেন তখন ক্যামেরার এঙ্গেলটাও সেদিকে যাচ্ছে। ডিরেকশন অসাধারণ, এটা একটা মাস্টার

পিস। আর এরকম ভালো সিনেমা আমাদের আরো প্রয়োজন। এই সব সিনেমার বাজেট অনেক। কয়েক মিলিয়ন ডলার লাগে। এখানে বিগ বাজেটের ব্যাপার আছে। কিন্তু সিনেমাটা ব্যবসা সফল হয়েছিল। মোস্তফা আকতার এরপর আরো একটি ছবি বানিয়েছিলেন। নাম ছিল 'ওমর মুকতার'। এটা সরাসরি ইসলামের কথা বলেনি। একজন মুসলিমের কথা বলেছে। আর এই সিনেমাটাও বক্স অফিসে হিট করেছিল। এ রকম সিনেমা আরো দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন শরিয়াহ সিদ্ধ হয়। কুরআন আর সুন্নাহ অনুসরণ করা হয় যথাযথভাবে। সার্বিক বিচারে The Message একটি আদর্শ ছবি। সব মিলিয়ে সিনেমাটা ভালো। তবে কিছু ভুল জিনিসও দেখানো হয়েছে। তবুও সিনেমাটিকে ভালো বলতে হবে।

ইসলামি শরিয়াহ মেনেই এরকম সিনেমা বানাতে হবে। কিন্তু কখনোই আমরা কুরআন আর হাদিসের বিরুদ্ধে যাব না। শরিয়াহ মেনেই বানাব। শুধু সিনেমাই নয়; নাটক সিরিয়াল আর ডকুমেন্টারিও বানাতে হবে। মিডিয়া জিনিসটা আসলে একটা সাদা হাতি, আপনারা হয়তো 'কৌন বানেগা ক্রোড় পতি'র নাম শুনেছেন। অনুষ্ঠানটা হুবহু 'ওয়ান স্টফিয়া মিলিয়ন'এর মতো। এখানে প্রতি অনুষ্ঠানে এক মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। মাত্র একটি টিস ওয়াটে চার কোটিরও বেশি রুপি খরচ হয়। ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট ধরে চলে প্রগ্রামটি। মুম্বাইতে লেবার কস্ট অনেক কম, তবে অমিতাভ বচ্চন এক্সপেনসিভ। তাহলে এসব ক্ষেত্রে বাজেটের সীমা নির্ধারণ করা আছে। যাদের এসব খরচ বহনের সামর্থ্য আছে তারা যদি স্পন্সর করেন তাহলে এমন ফিল্ম বানিয়ে আমরা ইসলামকে প্রচার করতে পারি। আমি বিশ্বাস করি- وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

অর্থ : তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ। (সূরা আলে ইমরান ৫৪ নং আয়াত)

হলিউড The Kingdom of Heaven নামে একটি সিনেমা বানিয়েছে। ডিরেক্টর এখানে দেখিয়েছেন কীভাবে ক্রুসেডাররা আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। একসময় সালাউদ্দিন আয়ুবি আসলেন। এখানে তাকে হিরো দেখানো হয়েছে, এ ব্যাপারটা নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়ায় খুবই হৈচৈ পড়েছিল। একজন খ্রিস্টান এমন সিনেমা কীভাবে বানালেন। সিনেমাটিতে সত্য কথা তুলে ধরা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারটা পশ্চিমারা হজম করতে পারেনি। কিন্তু যেহেতু সিনেমার ডিরেক্টর খুবই বিখ্যাত ছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ, এ কারণে তার খুব বেশি একটা ক্ষতি হয়নি। তাহলে একজন অমুসলিমও এমন সিনেমা বানিয়েছেন। যদিও আমি সিনেমাটা দেখিনি, তবে নিউজ রিপোর্ট পড়েছি। সিনেমাটা চমৎকার। এখানে তুলনামূলকভাবে সত্য কথাই উচ্চারিত হয়েছে। এমন সিনেমাকে উৎসাহিত করতে হবে।

banglainternet.com

প্রশ্ন : ফিল্ম মুসলিম মিডিয়াকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? আরব বিশ্বের ব্যাপারে কী বলবেন? বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলোকে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে?

ধর্মপ্রচারে মিডিয়ায় সম্পদ ব্যয়

উত্তর : মুসলিম বিশ্ব আজ অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই ইসলামিক কৃষ্টি-কালচার ছড়িয়ে দিতে কুরআন-হাদিসের আলোকে ফিল্ম তৈরির মাধ্যমে আমরা সহজেই মিডিয়াকে ব্যবহার করতে পারি। আমি আরব বিশ্বের ব্যাপারে কী বলব, বিশেষ করে ইন্ডিয়ার সাথে যখন তাদের তুলনার বিষয়টি আসে। দেখবেন সময়ের সাথে সাথে আমাদের পরিস্থিতিও বদলে গেছে। মাত্র কয়েক দশক আগেও আরবরা ইন্ডিয়ায় আসত ব্যবসা করার জন্য। তখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ইন্ডিয়া ছিল সবচেয়ে এগিয়ে। তাতে আরবদের অনেক উপকার হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আরবদের অনেক দামি সম্পদ খনিজ তৈল দিয়েছেন। এগুলো উত্তোলন করে তারা অনেক ধনী। আজ ইন্ডিয়ানরাই আরব বিশ্বে চাকরি করতে যায়, ব্যবসা করতে যায়। আলহামদুলিল্লাহ। মুসলিমদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেই হয়, যে কথাটা আমি আগেও বলেছি, ইসলাম প্রচার করা সব মুসলিমেরই দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে অনেক বেশি সম্পদ দিয়েছেন। তাই কিয়ামতের দিন আপনাদেরকেই বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন, আমি তোমাদের সম্পদ দিয়েছিলাম, তা দিয়ে তোমরা কী করেছ? আমিও বলব, আল্লাহ আপনাদেরকে বেশি সম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে আপনারা এখন খনিজ সম্পদের মালিক। তাই ইসলাম ধর্ম প্রচারে এই সম্পদ ব্যবহার করুন। শুধু ইন্ডিয়াই নয়। অন্যখানেও এ সম্পদ ব্যবহার করুন। ইন্ডিয়ায় অনেক সমস্যা আছে। সমস্যা নেই একথা বলব না। তবে আলহামদুলিল্লাহ, আমরাই নিজেদের ব্যাপারগুলো দেখব। কিন্তু প্রয়োজন আছে অন্যদেরও।

ইন্ডিয়ায় যেমন অনেক ইয়াতিম শিশু আছে, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়ও তেমনি ইয়াতিম শিশু আছে। মানুষ তাদের সাহায্য করছে। আলহামদুলিল্লাহ, এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে সামগ্রিকভাবে, আরবদের উদ্দেশ্যে আমি একথা বলব, যেহেতু আল্লাহ তাদের তেল ও স্বর্ণ সম্পদ দিয়েছেন, তাই তাদের উচিত হবে সত্যের ধর্ম প্রচারে এগিয়ে আসা। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক আরবদের চিনি। তাদের পকেটে যে টাকা থাকে, সে পকেট-মানি দিয়েই পাঁচ দশটা চ্যানেল খুলতে পারে। পাঁচ থেকে দশটা চ্যানেল। আল্লাহ তাদের দিয়েছেন এই অগাধ সম্পদ। তাই আমি তাদের অনুরোধ করব তারা যেন সম্পদের সঠিক ব্যবহার করেন। ব্যবহার করেন ভালো কাজের জন্য, দ্বীন প্রচারের জন্যে। আখিরাতের কল্যাণের জন্যই এটা করতে হবে। এতে সৃষ্টিকর্তার কোনো লাভ লোকসান হবে না। এটা করতে হবে আমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই। পবিত্র কুরআনেই বলা হয়েছে— الله الصمد

অর্থাৎ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তাহলে ইনশাআল্লাহ রোজ কিয়ামতের দিন এই সওয়াব তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন : বলা হয়ে থাকে মিউজিক হারাম। এটা সব মুসলিমই জানে। ইতোমধ্যেই আপনারা পিস টিভি নামে একটি টিভি চ্যানেল চালু করেছেন। আমার জানা মতে মিডিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন এর বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার করা হয়। বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার হালাল নাকি হারাম?

শরিয়াহ মেনেই টিভি চালাতে হবে

উত্তর : সব মুসলিমই জানে যে মিউজিক হারাম। তবে টিভি চ্যানেল চালাতে হলে সেখানে বিজ্ঞাপন থাকবেই। এখন এ বিজ্ঞাপনের মিউজিক হালাল না কি হারাম? দেখেন যেটা হারাম সেটা হারামই। যেটা সৌদি আরবে হারাম, সেটা আরব আমিরাতেও হারাম। আমেরিকাতেও হারাম। অনুরূপভাবে ইন্ডিয়াতেও হারাম। তবে যদি আপনার জীবন বিপন্ন হয়, আর এলকোহলই আপনাকে বাঁচাতে পারে, তবে ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে ওষুধ হিসেবে এটা পান করতে পারেন। এটাই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম, যদি জীবন বিপন্ন হয়। তবে কোনো বিজ্ঞাপন না থাকলেও আমাদের চ্যানেল বিপদে পড়বে না ইনশাআল্লাহ।

আমি এজন্যই বলছিলাম একটি চ্যানেল চালানো বেশ কঠিন। বিশেষ করে ইসলামি শরিয়াহ মেনে চালানো আরো কঠিন। সে জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আমরা যেন শরিয়াহ মেনে চালাতে পারি। যদি ইসলামি শরিয়াহ মেনে চালাতে না পারি, তাহলে চ্যানেল বন্ধ করে দিব। কারণ ইসলামিক শরিয়াহ মেনে চলাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চ্যানেল চালু রাখাটা নয়। আপস করা যাবে না। আমরা হারাম উপায়ে সত্যকে প্রচার করতে পারব না। যেটা হারাম, সেটা হারামই। আমরা এসব হারামকে হালাল কিছু দিয়ে বদলে দিতে পারি। যেটা হারাম সেটা বাদ দিয়ে হালাল জিনিস আনব। যেমন ধরুন, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম। তবে দফের অনুমতি আছে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করতে পারি। যেমন— পানি পড়ার শব্দ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

যদি আইআরএফ এর অনুষ্ঠানগুলো দেখেন আপনাদের মনে হবে না যে কোনো মিউজিক নেই। যদিও আমরা মিউজিক ব্যবহার করি না। তবে এ প্রাকৃতিক শব্দগুলো সেই সব অনুষ্ঠানে যেভাবে শুনবেন, এটা সেরকম নয়। আলহামদুলিল্লাহ, এই শব্দগুলো একই রকম নয়। কিন্তু শুনতে মিউজিকের মতো। তবে প্রভাব ভালো, এটা আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এটা আপনাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসবে। আমরা এমন কোনো বিজ্ঞাপন দেখাব না যেটা

banglainternet.com

হারাম। কোনো হারাম বিজ্ঞাপন দেখাব না। যেমন, কোনো এলকোহল নিয়ে বিজ্ঞাপন; অথবা সুদ নিয়ে কাজ করে এমন কোম্পানি বা ব্যাংক বা যেসব বিজ্ঞাপনে মহিলাদের শরীর দেখানো হয়ে থাকে তা প্রচার করবো না। যদি শরীয়ত সম্মতভাবে নির্মিত বিজ্ঞাপন আমাদের চ্যানেলে দিতে চান তাহলে স্বাগত জানাই। তা না হলে বিজ্ঞাপনের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন একমাত্র আল্লাহর সাহায্য। আর সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : কুরআনে সূরা আলাকে বলা হয়েছে– আল্লাহ মানুষকে একটা জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমি এই কয়েকদিন আগে পবিত্র কুরআনের এই সূরাটির উর্দু অনুবাদ শুনেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল যে রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়। আমরা এটা জানি। মানে এখন এটা সবাই জানে, আমরা মানুষ জাতি জন্মাই কোনো রক্তপিণ্ড থেকে নয়, শুক্রাণু থেকে। আর আমি এরকম একটা অনুবাদও পড়েছি। অন্য আরেকটা আয়াতে উল্লেখ আছে– পরে আমি এই বিন্দুকে (শুক্রাণু) পরিণত করি রক্তপিণ্ডে। তারপর এই রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। আমার মনে হয় না যে, এ সময় এটা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। আপনি একজন ডাক্তার। আপনি কি বিষয়টা বুঝিয়ে বলবেন?

ভ্রূণতত্ত্বে একাধিক শব্দের অর্থ

উত্তর : প্রথমেই বলছি জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করুন। কেননা পবিত্র কুরআনের সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতে এবং সূরা আম্বিয়ার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো'। আমি খুব বেশি জানি না। তবে আলহামদুলিল্লাহ সামান্য একজন এমবিবিএস ডাক্তার এবং বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যতটুকু জানি। একই যুক্তি দেখিয়েছিলেন ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। আমি একবার তার সাথে বিতর্ক করেছিলাম। তিনি একজন ডাক্তার। আল কুরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে তিনি পিএইচডি করেছিলেন। তার বইতে লিখেছিলেন, কুরআনে ৩০টি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। আট বছরে কোনো মুসলিম এর উত্তর দেননি। আমেরিকান ছাত্ররা আমাকে একটা বিতর্কের জন্যে ডেকেছিল। কয়েক বছর আগে আমি আমেরিকার শিকাগোতে গিয়েছিলাম। বিতর্কের বিষয় ছিল– 'বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন এবং বাইবেল'। আর তার একটা যুক্তিও ছিল আপনার অনুরূপ। সূরা আলাক বা সূরা ইকরা ১ ও ২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔

অর্থ ঃ পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে অর্থাৎ জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে।

ডাঃ ক্যাম্পবেলের মতে, কুরআনের এই কথাগুলো হচ্ছে নকল করা। গ্রিকরা এভাবে ভাবত যে মানুষ তৈরি হয় রক্তপিণ্ড থেকে। এটা একটা পুরানো Theory যেটা ভুল বলে প্রমাণিত। আর মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে আমিও এটা জানি, মানুষ কোন রক্তপিণ্ড থেকে জন্ম নেয় না। তাহলে ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের মতে আমাদের নবী (স) অর্মুক অমুক জায়গা থেকে এগুলো নকল করেছেন। তিনি আরও বলে দিলেন, আমাদের নবীজি হযরত মুহাম্মদ (স) এটি নকল করেছেন সিরিয়ানদের ও গ্রিকদের কাছ থেকে (নাউজুবিল্লাহ্)। ডা. ক্যাম্পবেল নাকি এগুলো পিইচডি করতে গিয়ে রিসার্চ করে জেনেছিলেন। তিনি আরো বললেন, আপনারা যেসব অনুবাদ পড়েন সেখানে বলা হয়েছে রক্ত, রক্ত, রক্ত। তবে ইদানীং কিছু মুসলিম অনুবাদ করেছেন আলাক অর্থ জোঁকের মতো কিছু একটা। তিনি এটা জানতেন, আমি জানতাম না। তিনি জানতেন। তবে তখন বলেছিলেন, কুরআন নাযিলের সময়ে তখনকার লোকেরা যে অর্থটা বুঝত আমাদের সেই অর্থটা নিতে হবে। এখনকার সময়ের কোনো অর্থ নিতে পারি না।

একথা ঠিক, কুরআন নাযিলের সময় কোনো মানুষই এটাকে জোঁক বলে মনে করেনি। এজন্য আপনারা পূর্বের যে তাফসিরগুলো পড়ে থাকেন সবাই বলেছে– রক্তপিণ্ড। একথা কেউ বলছে না যে আলাক জোঁকের মতো কিছু, আর আমিও এর সাথে একমত। তবে আলাক শব্দটার তিনটি অর্থ বহন করে– ১. জমাট বাঁধা ২. রক্তপিণ্ড এবং ৩. জোকের মত কোন জিনিস ঝুলে থাকা। প্রফেসর কেইথ মূরকে কুরআনের এই আয়াতটা দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন এটা আমি জানি না, জোঁকের মতো দেখায় কি না। এরপর তিনি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর জোঁকের একটা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখলেন। আর দুটির মধ্যে মিল দেখে খুবই অবাক হলেন।

বর্তমানে মেডিকেল সাইন্সের বক্তব্য অনুযায়ী ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মতো। কিন্তু তার যুক্তি ছিল সে সময় যে অর্থটা করা হয় সেটা নিতে হবে, আজকেরটা নয়। আমাকে নিয়ম মানতে হবে। তারপরও আমি যখন লেকচার দিতে গেলাম তখন বললাম ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যা বললেন, সেই কথাগুলো শুধু পবিত্র বাইবেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সেই সময়ের একটা নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য ইঞ্জিল শরীফ নাযিল হয়েছিল। তাই বাইবেলের জন্য সেই সময়ের অর্থটাই নিতে হবে। তবে পবিত্র কুরআন শুধু মুসলিমদের, আরবদের বা সেই সময়ের জন্য

banglainternet.com

নাযিল হয়নি। কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষ জাতির জন্য। চিরস্থায়ী ধর্ম হিসেবে। তাই এখানে প্রতিটি অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

নাযিল হওয়ার সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য প্রতিটি অর্থকে যাচাই করে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো একটি অর্থ সঠিক হতে পারে কিংবা সঠিক হতে পারে প্রতিটি অর্থই। ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল মরোক্কোয় প্রাকটিস করেছিলেন। তিনি আরবিতে কথাও বলতে পারতেন। সর্বোপরি ড. ক্যাম্পবেল চিকিৎসা বিজ্ঞানে DM বা ডক্টরেট অব মেডিসিন। আর আমি সামান্য MBBS। তিনি আমার চেয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারী– পিএইচডি করেছেন কুরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে। আরবিতে কথা বলতে পারেন, আমি পারি না। আমরা বিতর্ক করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, আপনি যদি বাইবেলের কথা বলেন, ঠিক আছে। বাইবেলের ক্ষেত্রে অর্থটা নিতে হবে সে সময়ের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে নিতে হবে সব সময়ের জন্য প্রতিটি অর্থই।

এখন যে অর্থটা করা হয় তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। কারণ ভ্রূণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কেইথ মূর বলেছেন এবং তার বইতেও তিনি লিখেছেন ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মতোই। তাই এ বিষয়ে আপত্তি চলে না। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে দ্বিতীয় অর্থটা ঝুলে থাকা। এটা ঝুলে থাকে সেটাও ঠিক। কারণ ভ্রূণ মায়ের পেটের ভেতরে ঝুলে থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হয় না। তখন এটি রক্তপিণ্ডের মতো দেখায়। তাহলে রক্তপিণ্ড বলাও সঠিক। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড থেকে। দেখতে অনেকটা জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ডের মতো। এখন আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি ভ্রূণ মায়ের পেটে ঝুলে থাকে। আর আকৃতিতে জোঁকের মতো। তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, তিনটা অর্থই সঠিক। তাহলে রক্তপিণ্ড, ঝুলন্ত অবস্থা, সর্বোপরি জোঁকের মতো প্রতিটি অর্থই এখানে মানানসই।

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে জিহাদ সম্বন্ধে এমন কোনো সীমারেখার কথা কি বলা হয়েছে যে আপনি এই পর্যন্ত যেতে পারবেন– যদি জিহাদ করতে চান?

শরিয়ায় স্বীকৃত জিহাদের সীমারেখা

উত্তর : জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নিজের অহংকারের বিরুদ্ধে জিহাদ। জিহাদ আন্ নফস। সর্বোচ্চ লেভেল। আর যতক্ষণ কুরআন অনুমতি দিচ্ছে আপনি যেকোনো সীমারেখা পর্যন্ত যেতে পারেন। তবে আপনি শরিয়াহ ভাঙ্গতে পারবেন না। আপনি যেকোনো সীমা পর্যন্ত যেতে পারবেন। তবে সেটা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী হতে হবে। ইসলামি শরিয়ার বাইরে যেতে পারবেন না। সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো নিজের অহমিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

আমরা আমাদের নবী (স) এর একটা হাদিসের দৃষ্টান্ত দেখি। যখন নবী (স) মক্কায় ছিলেন তখন পবিত্র কুরআনে বেশ কিছু সূরা নাযিল হয়। এগুলো হলো মক্কী সূরা আর মদিনায় নাযিলকৃত সূরাগুলো হলো মাদানী সূরা। এ দু'জায়গায় নাযিলকৃত সূরার মধ্যে পার্থক্য হলো– মক্কী সূরায় কীভাবে ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা দান করা হয়েছে। আর মাদানী সূরায় বলা হয়েছে কীভাবে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইকামাতে দ্বীন অর্থাৎ জিহাদ। আমরা জানি, তখন যে মুসলিমরা মদিনায় এসেছিলেন, আগের চেয়ে তাদের অবস্থা শক্তিশালী হয়েছিল। তখন বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছিল। তাই এসব সূরায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে। কিতালের কথা বলা হয়েছে। তবে মক্কা শহরের অমুসলিমরা যখন বেশ কিছু মুসলিমকে নির্যাতিত করে মেরে ফেলেছিল তখন অনেকেই লড়াই করতে চেয়েছিলেন। যেমন হযরত হামযা, হযরত উমর (রা) তার পাল্টা জবাব দিতে চেয়েছিলেন। তারা ছিলেন যোদ্ধা। কিন্তু নবী (স) বললেন, ধৈর্য ধারণ কর। তখন সবর করাই ছিল জিহাদ। যদি সামর্থ থাকে আর পাল্টা আক্রমণ করেন সেটা ভালো। আপনার আক্রমণ করার সামর্থ আছে, তারপরও সবর করছেন, আক্রমণ করলেন না, এটা আসলে অনেক বড় জিহাদ।

হযরত হামযা (রা) কে বলা হতো মরুভূমির সিংহ। লোকজন তাকে ভয় পেত। এক পরিস্থিতিতে তিনি বললেন, আমার ভাইদেরকে কারা হত্যা করল? আমি হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু নবী (স) বলছিলেন এটা করা যাবে না। তাহলে তার জিহাদ ছিল নিজেকে কন্ট্রোল করা, সবর করা। একেক সময় জিহাদ একেক রকমের হয়। জিহাদের অর্থ শুধু শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়। কেননা সবরও এক ধরনের জিহাদ। একদিন হযরত আয়েশা (রা) নবী (স) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমরাও কি জিহাদ করব? তিনি সেখানে যুদ্ধের কথা বলেছিলেন। হাদিসটা সহীহ বুখারীর। নবী (স) বলেছেন, তোমার জন্য জিহাদ হলো একদম সঠিকভাবে হজ্জ পালন করা। আয়েশা (রা) এর জন্য হজ্জই ছিল শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

এছাড়াও আরেকটি হাদিস আছে সহীহ বুখারীতে। এক লোক নবী (স) কে প্রশ্ন করলেন, আমরাও কি জিহাদে যাবো? এখানে জিহাদ অর্থে কিতালের কথা বলা হচ্ছে। নবী (স) বললেন, তোমার কি বাবা-মা আছে? সে বলল– হ্যাঁ। তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে তোমার বাবা-মা'র সেবা করা। তাহলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে জিহাদ একেক সময় একেক রকম হয়। এছাড়াও সুনানে নাসায়ীতে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী (স) বলেছেন, কোনো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কথা বলাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।

banglainternet.com

নবী (স) জানতেন ঐ লোকের বাবা-মায়ের সেবা প্রয়োজন। অর্থাৎ পরিস্থিতি ভেদে জিহাদ একেক সময় একেক রকম হয়। জিহাদের আপনি কতদূর যেতে পারবেন? আপনি সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করতে পারেন। এরকম একটা জিহাদ বা কিতালের সময় নবী (স) সাহাবিগণকে বললেন, কিতালের জন্য তোমাদের সম্পদের যতখানি দিতে পার দান কর। এটা একটা সহীহ হাদিস। হযরত উমর (রা) খুব ধনী ছিলেন। তার অনেক সম্পদ ছিল। তিনি সম্পত্তির অর্ধেক দান করলেন। নবী (স) এর হাতে তুলে দিলেন। আর বললেন, 'মাশাআল্লাহ আমার সম্পদের অর্ধেক দান করেছি।' তিনি ভেবেছিলেন তিনিই সবার উপরে। তার অর্থ তিনি সবচেয়ে সেরা পুরস্কারটা পাবেন। তিনিই সবার উপরে আছেন। নবী (স) তখন বললেন, হযরত আবু বকর (রা) (ইসলামের প্রথম খলিফা) দ্বীনের পথে তাঁর পুরো সম্পত্তি দান করেছেন। তাই তিনি হযরত উমর (রা) এর চেয়ে বড় পুরস্কার পাবেন। পরিমাণের মাপকাঠিতে হযরত আবু বকর (রা) যা দান করলেন তার তুলনায় হযরত উমর (রা) এর দান করা সম্পদ অনেক বেশি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন। তাই তিনি হযরত উমর (রা) এর চেয়ে অনেক বেশি সওয়াব পাবেন। (আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন)। কারণ তিনি নিজের ভোগের জন্য সম্পত্তির কোনো অংশ রাখেননি। তাই যদি জিহাদ করতে চান তাহলে আল্লাহ শরিয়াতে যে সীমা নির্ধারণ করেছেন সেই সীমা পর্যন্ত যেতে পারেন।

প্রশ্ন : ইসলামের আলোকে আত্মঘাতী বোমা হামলাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ইসলামে আত্মহত্যা হারাম

উত্তর : যদি আত্মঘাতী বোমা হামলার কথা বলা হয়, তবে আত্মঘাতী সম্পর্কে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই শেখ নাসির উদ্দীন আলবানী, শেখ বিন বাদ, শেখ হুদায়মী তিনজনই বেশ বড় মাপের বিশেষজ্ঞ। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। তারা এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে, আত্মঘাতী বোমা হামলা করা হারাম। তবে আরো বিশেষজ্ঞ আছেন যেমন শেখ জাফর আলী হাওয়ালী, শেখ সালমান আওদা তাদের মতামত কিছুটা ভিন্ন। আমাদের প্রথমেই আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা করা হারাম– এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, এটি স্পষ্ট। তবে আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। তাদের মতে, আত্মঘাতী শব্দটা এখানে সঠিক নয়। শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ হয়নি। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন তার জীবন সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে তার জীবনটা শেষ করে দিতে চায়। আর এখানে তাদের মতে এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। এখানে উদ্দেশ্য হলো– শত্রু পক্ষের ক্ষতি সাধন করা। আর এটা করতে গিয়ে এই সম্ভাবনাই বেশি যে তারা মারা যাবে। সে জন্য এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। অনেক বিশেষজ্ঞ যেমন শেখ সালমান আওদা বলেন– এটা সঠিক। তবে এর মানে এই

নয় যে একজন মুসলিম ইচ্ছে করলেই শরীরে বোমা বেঁধে হামলা করতে পারবে।

এসব ক্ষেত্রে সালমান আওদা, জাফর হাওয়ালী বলেন– এটা হারাম। আমি আগেই বলেছি যে, আত্মঘাতী হামলার সংস্কৃতি ইসলাম ধর্মে ছিল না। এটা ইসলামে আগে ছিল না। তবে কিছু মুসলিম আছে ফিলিস্তিনে অথবা ইরাকে তারা এমন করেছে। তবে তাদের মতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে না পেয়ে শেষ উপায় হিসেবেই এমনটা করেছে তারা। এসব জায়গায় অনেক মুসলিমকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে। তখন তারা পরিকল্পনা করেছিল আমরা একাই মরব না; সঙ্গে আরো কিছু লোক নিয়ে মরব। আর উদ্দেশ্য হলো শত্রু পক্ষের ক্ষতি করা। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, যুদ্ধের কৌশল হিসেবে নিরুপায় হয়ে শেষ অস্ত্র হিসেবে এটা করা যেতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বিশেষজ্ঞ সবকিছু বিবেচনা করে বলেন, এটার অনুমতি আছে।

আমি আগেই বলেছি ইরাকে আমেরিকান সৈন্যরা আসার আগে আত্মঘাতী হামলা ছিল না। আত্মঘাতী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রবার্ট পেপের মতে, বেশির ভাগ সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে আত্মঘাতী হামলা সংঘটিত হয়। যেমনটা হয়ে থাকে দেশ থেকে আগ্রাসী সামরিক সরকার হটানোর জন্য। এ কথাটা রবার্ট পেপে বলেছেন, তার লেখা 'ডাইয়িং টু উইন' গ্রন্থে। তবে আত্মঘাতী হামলাকে যেসব বিশেষজ্ঞ অনুমতি দিয়েছেন তারাও একথা বলেছেন যে এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ সব নির্দেশনা দিবেন। যিনি ইসলামি শরিয়াহ ভালভাবে জানেন তিনি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তবে নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে পারবেন না। ইসলামে এটা হারাম। সূরা মায়িদার ৩২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.

অর্থ : এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করল।

প্রশ্ন : প্রায়ই নাস্তিকেরা বলে থাকে যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? কীভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিব?

আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেনি

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে বলা যেতে পারে– আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেননি। তাই কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন এ প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যদি আমি বলি, অমুক আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তিনি আল্লাহ নন।

banglainternet.com

পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে উল্লেখ করা হয়েছে–

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ: তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তার সমতুল্য কেউই নেই।

তাই আল্লাহ তাআলার সংজ্ঞা হলো- তাকে কেউ সৃষ্টি করেননি। তাহলে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে এমন প্রশ্নই অযৌক্তিক। বস্তুত যখনই আল্লাহকে সৃষ্টি করার কথা বলছি তিনি তখন আল্লাহ হবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলাকে কেউ সৃষ্টি করেননি। তিনিই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল। তিনি কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। এখন একজন নাস্তিককে কীভাবে আপনি বুঝাবেন। আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেট "Is the Quran God's Word?" দেখতে পারেন, এ প্রশ্নের উত্তরটা জানবেন। এছাড়াও জানতে পারবেন কীভাবে একজন নাস্তিককে বোঝাতে হবে। এই ভিডিওটা দেখলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

প্রশ্ন : ১১ই সেপ্টেম্বর নিয়ে মিডিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে কি কোনো ভূমিকা পালন করছে?

১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে ইসলাম আক্রমণ

উত্তর : প্রশ্নটা এখন আর গোপনীয় নয়। কেননা মিডিয়াগুলো প্রচার করেছে আনুমানিক ১৩ জুন কয়েকজন আরবীয় একটা প্লেন নিয়ে World trade center ক্রস করেছিল। এটা তারা কীভাবে জানল? তারা কীভাবে সেখানে একটি পাসপোর্ট পেয়েছিল? চিন্তা করুন দুই হাজার ডিগ্রির তাপমাত্রায় সব পুড়ে গেল শুধু পাসপোর্টটাই রয়ে গেল। কৌতুক করে বলা হয়েছিল যে, এখন থেকে আমেরিকার সৈন্যদের ইউনিফরম বানানো হবে সেই পাসপোর্ট দিয়ে। খবরে বলা হলো, এই মুসলিম আরবরা প্লেনে উঠার আগের দিন তাদের দোকানে গিয়ে নাকি মদ খেয়েছিল। চিন্তা করুন, যারা জানে পরের দিনই মারা যাবে, তারা কিনা আগের দিন মদের দোকানে গেল! মিডিয়া এসব ইনফরমেশন কোথা থেকে পায়? এটা স্রেফ অপবাদ।

কাজটি কে করেছে? উসামা বিন লাদেন করেছে। চিন্তা করুন যেখানে Central Intelligence Agency বা CIA এর নজরদারীর বাইরে পেন্টাগণের ওপর দিয়ে একটি পাখিও ওড়ে না সেখানে একটা প্লেন এসে সোজা পেন্টাগন ক্রস করল। এরপর অনেক Theoryও বলা হয়েছে, এগুলোকে Theory বলছি। কারণ এগুলো প্রমাণিত নয়, তাহলে কীভাবে হয়েছে? বিশেষজ্ঞরা পরে পেন্টাগনে পরীক্ষা করে বলেছেন এই বিস্ফোরণ কোনো এ্যারোপ্লেনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এসব খবরের

উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের নামে অপবাদ দেয়া। মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে এসব প্রচার করেছে। এছাড়াও কয়েকটা Theory এমন বলেছে যে, এই কাজটা ভেতরের কেউ করেছে। যেভাবে World trade center টা ভেঙ্গে পড়েছে। সেটা প্লেনের আঘাতে হতে পারে না। ভেতর থেকে কেউ করেছে। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে যাই ঘটুক, তারা ইসলামকে যতই আক্রমণ করুক, পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ৫৪ নং আয়াত আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। এখানে বলা হয়েছে–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

অর্থ: তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহই কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।

এত কিছু সত্ত্বেও মিডিয়া ইসলামকে আক্রমণ করেছে। তারপরও পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের প্রসার এখনও বেশি। এমনকি আমেরিকা, ইউরোপেও।

প্রশ্ন : ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহিলারা কি মিডিয়ার সামনে আসতে পারেন? অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞই মহিলাদের অডিও রেকর্ড করার অনুমতি দেন না। কারণ সে ক্ষেত্রে অন্য পুরুষ তার কণ্ঠস্বর শুনে ফেলবেন। এটার কি অনুমতি আছে?

মিডিয়ায় মহিলা প্রসঙ্গে মতভেদ

উত্তর : মিডিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণকে ঢালাওভাবে হারাম বলা যাবে না। এখানে কিছু ব্যাপার অবশ্যই হালাল। যেমন–মহিলারা Article লিখতে পারবেন, সেটাকে কোনো বিশেষজ্ঞই হারাম বলতে পারবে না। খবরের কাগজে অথবা ইন্টারনেটে তারা Article লিখতে পারবেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই অংশ নিতে পারেন। আর Audio Media এর কথা যদি বলি, এটা নিয়ে নানাবিধ মতভেদ আছে। কেউ বলবেন পারবেন, কেউ বলবেন পারবেন না। বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের কণ্ঠস্বর নিয়ে তেমন কিছু বলেন না। তবে এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক থাকতে হবে। Audio Media এর ক্ষেত্রে সচেতন থাকবেন, আপনার কণ্ঠস্বর যেন বেশি ওঠানামা না করে। সে সময় বেশি হাসাহাসিও করবেন না। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এমন ক্ষেত্রে অনুমতি দেবেন।

এবার টিভির সামনে আসা নিয়ে বলছি। এখানেও বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন, মহিলারা টিভির সামনে আসতে পারবে না। অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন, মহিলারা যদি হিজাব পরিধান করে, শরীর পুরোপুরি ঢেকে রাখে, কেবল মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খোলা রাখে এবং কণ্ঠস্বরে যদি উত্তেজক কিছু না থাকে, আর যদি শরীয়ার অন্য নিয়মগুলোও মেনে চলে, তাহলে তাকে অনুমতি

banglainternet.com

দেয়া যেতে পারে। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই বলেন– না, মহিলারা টিভি অনুষ্ঠানে আসতে পারবে না। কারণ পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

অর্থ : মুমিনদিগকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।

এই আয়াত এবং বেশ কিছু হাদিস নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে আমি সৌদি আরবে শুনেছিলাম, সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ফকীহ নাসির আল আওয়াদ মহিলারা যদি ঠিকমত পোশাক পরে এমনকি যদি তার মুখে নিকাব নাও থাকে তারপরও টিভি প্রগ্রাম করার অনুমতি দিয়েছেন। কারণ নিকাব দেয়াটা ফরয নয়। যদিও অনেকে বলেন ফরয। তবে শেখ নাসির আলবানীর মতো আরো কয়েকজনের অভিমত নিকাব (যেটা দিয়ে মুখ ঢাকে) ফরয নয়।

সৌদি আরবের নাসির আল আওয়াদ বলেছেন, মিডিয়ার গুরুত্বের কারণে আমরা মহিলাদের টিভিতে আসার অনুমতি দিতে পারি। তবে এখনও এ নিয়ে মতভেদ আছে। এখনও বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই মনে করেন মহিলারা টিভি-র সামনে আসতে পারবেন না। কারণ সেটা কুরআনের বিরুদ্ধে যাবে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করবে। মহিলাদের যদি টিভিতে দেখানো হয় সেখানে অন্য পুরুষেরা তাদের দেখতে পাবে। এজন্য মহিলাদের অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে অনেক মতভেদ আছে। তবে আপনি আপনার পছন্দমত একটা বেছে নিতে পারেন।

প্রশ্ন : ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা খবর ছড়ানো হচ্ছে, এক্ষেত্রে একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের কী করা উচিত?

মিডিয়ার অপপ্রচারের সঠিক জবাব

উত্তর : ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করতে গেলে প্রথমেই দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যেকোনো বিষয়ে জবাব দেয়ার সময় হীনমন্যতায় ভুগবেন না। উত্তর দিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করুন। তবে ইসলাম সম্পর্কে আপনার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। আর আপনিও এসব অনুশাসন ঠিকভাবে পালন করবেন। যদি আপনি সঠিকভাবে অনুশীলন না করেন তাহলে ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করবেন। সেজন্য প্রথমে আপনি সঠিকভাবে অনুশীলন করবেন কুরআন এবং হাদিসের। আর আপনার অমুসলিম বন্ধুরা যদি প্রশ্ন করে, আর সে প্রশ্নের উত্তর না জানলে কুরআন বলছে, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করুন; ইন্টারনেটে দেখুন এবং সঠিক উত্তর বের করুন। অথবা বিশেষজ্ঞ কারো কাছে জিজ্ঞেস করুন। তারপর উত্তর দিন। এক্ষেত্রে উত্তর দিন হিকমার সাথে, বিজ্ঞানের আলোকে, কুরআন এবং হাদিস অনুসারে।

প্রশ্ন : কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান নিউজ চ্যানেলে একটা সংবাদ প্রচার করা হয়েছে যে এক মহিলাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে। তিনি (শ্বশুর) একজন মুসলিম। হুজুররা ফতোয়া দিলেন মহিলাটির এখন শ্বশুরকে বিয়ে করতে হবে। তার স্বামী এখন তার জন্য হারাম। এ ব্যাপারে প্রকৃত সমাধান কী হবে?

মিডিয়ায় ইসলামকে হেয় করা

উত্তর : মিডিয়ার কাছে এ ব্যাপারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আর আপনারা হয়তো জানেন, কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়াতে ইমরানা নামে একজন গৃহবধূকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছেন। তখন বেশির ভাগ ইন্ডিয়ান উলামাই ফতোয়া দিয়েছিলেন, যেহেতু মেয়েটাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে সেহেতু সে আর তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছে। আর মিডিয়া যখনই দেখল যে এ খবরটা দিয়ে ইসলামের নিন্দা করা যায় তখনই সেটা তারা লুফে নেয়। তারপর খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যেন ইসলাম ধর্মে এই ইস্যুটা ছাড়া আর কোনো ইস্যু নেই। আর ইন্ডিয়ান প্রেস ও চ্যানেলগুলো বলে যে ঐ গৃহবধূই একজন ভিকটিম। কিন্তু ইসলাম ধর্ম কী বলেছে, ইসলাম তাকে সাহায্য না করে উল্টো আরো বলছে, মেয়েটা তার স্বামীর কাছে যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম।

মিডিয়া তারপর এই খবরটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি আজকেও ছড়াচ্ছে। তবে আমি বলেছি, আপনি যদি মিডিয়ার সামনে কথা বলতে না জানেন আপনাকে ট্রেনিং নিতে হবে। আর ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই অন্য কয়েকজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ বলেছেন– না, না, ধর্ষিতা তার স্বামীর জন্য হারাম নয়। মেয়েটি তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। যারা ফতোয়া দিয়েছে 'মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম' তারা ভুল বলেছে। তারপর তারা এ ব্যাপারটা নিয়ে অমুসলিমদের সামনে তর্কযুদ্ধ শুরু করল। আমরা এভাবে আমাদের দুর্বলতাগুলো অন্যদের সামনে উপস্থাপন করি। আশ্চর্যের বিষয় হলো বিশেষজ্ঞদের উভয় দলই তাদের ফতোয়ার সপক্ষে পবিত্র কুরআনের একটি নির্দিষ্ট আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যারা ফতোয়া দিয়েছেন যে মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম, তারা সূরা নিসার ২২নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ

অর্থ : নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।

banglainternet.com

বস্তুত আরবি ভাষায় 'নিকাহ' শব্দের দুটো অর্থ আছে। একটা হলো বিয়ে, অন্যটি হচ্ছে সহবাস। আরবি ভাষা সম্পর্কে যারা ভালো জানেন তাদরেকে জিজ্ঞেস করলে তারাও একই কথা বলবেন। আর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রথম দলটা সংখ্যায় বেশি। এরা হলেন দারুল উলুমের একটা বিশেষ গ্রুপ। তারা নিকাহ শব্দটার অর্থ করেছেন সহবাস। নিকাহ শব্দটার অর্থ যদি সহবাস ধরা হয় তাহলে কুরআনের এ আয়াতে বলা হয়েছে তোমরা সহবাস করতে পারবে না তোমাদের বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমাদের খালার সাথে এবং তোমরা সহবাস করতে পারবে না সে মহিলার সাথে, যে সহবাস করেছে তোমাদের বাবার সাথে। এটার ওপর ভিত্তি করে তারা বলেছেন ছেলেটার বাবা এই মেয়ের সাথে সহবাস করেছে। এখন এই মেয়ে তার ছেলের সাথে সহবাস করতে পারবে না, সে জন্য মেয়েটার স্বামী তার জন্য হারাম।

অন্য আরেক দলের মতে- না, এটার অর্থ বিয়ে। এ নিয়ে তারা তর্ক করতে লাগল। আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে হিকমার সাথে। এখানে প্রথম পয়েন্টটি হলো ইমরানা নামের এই মেয়েটার সাথে যা হয়েছিল, তা সহবাস ছিল না। সেটা ছিল যিনা বিল জবর অর্থাৎ ধর্ষণ। 'ধর্ষণ' আর 'সহবাস' দুটো ভিন্নার্থক শব্দ, এক নয়। আর ধর্ষণকে আরবিতে 'নিকাহ' বলা হয় না।

এভাবেই পয়েন্টে পয়েন্টে আপনি শব্দ নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। যদি এটা সহবাস হয় এতেও সমস্যা নেই। দেখেন, আমি ইতোপূর্বেও বলেছি যদি কেউ ভুল কোনো কিছু বলে সেক্ষেত্রে বিতর্ক করার একটা টেকনিক আছে। যদি কেউ বলে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আমি তর্ক না করে বলব এই নিন এখানে দুই লক্ষ দিরহাম। আরো দুই লক্ষ দিরহাম। এবার আমাকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম দেন। সে তখন বলবে না, না। টেবিলটাকে ঘুরিয়ে দিন। আমাকে যখন প্রশ্ন করা হলো আমি বলেছিলাম, আমি তর্কের খাতিরে স্বীকার করলাম নিকাহ অর্থ 'সহবাস'। তাহলে কুরআনের এ আয়াতটার অর্থ দাঁড়ায়- তোমরা সহবাস করবে না তোমাদর বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমাদের খালার সাথে এবং সেই মহিলার সাথে যে তোমার বাবার সাথে সহবাস করেছেন। তার মানে কি কুরআন অনুমতি দিচ্ছে প্রতিবেশী মহিলার সাথে সহবাস করতে? অথবা অন্য কোনো মহিলার সাথে? তারা বলে- না, না। আমি বললাম- কেন? যদি বলেন যে নিকাহ অর্থ সহবাস। তাহলে কুরআন বলছে তোমরা সহবাস করবে না তোমাদের বোনদের সাথে, ফুফুর সাথে, খালার সাথে, আর যে মহিলার সাথে তোমার বাবা সহবাস করেছে। কিন্তু সহবাস করতে পারবে প্রতিবেশী মহিলার সাথে, অন্য যেকোনো মহিলার সাথে, তারা বলল- না। তাহলে সঠিক অর্থটা হচ্ছে নিকাহ মানে বিয়ে অর্থাৎ তোমরা বিয়ে করবে না তোমাদের বোনকে, ফুফুকে, খালাকে

এবং বিয়ে করবে না সেই মহিলাকে যাকে বিয়ে করেছে তোমার বাবা। তবে আপনি বিয়ে করতে পারেন প্রতিবেশী মহিলাকে অথবা অন্য যে কোনো মহিলাকে।

তাই আপনারা লড়াই না করে হিকমা দিয়ে এটা বুঝিয়ে দিন। আর কোনো বিশেষজ্ঞই এমন কথা বলবেন না প্রতিবেশী মহিলার সাথে অথবা অন্য যেকোন মহিলার সাথে আপনারা যিনা করতে পারেন। হিকমার সাথে উত্তর দিন। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেরাই তর্ক করছি। একে অন্যের সাথে। মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে সবার কাছে হাস্যকর বানিয়ে ফেলছি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : আমরা জানি, মিডিয়াগুলো সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক কিছুটা প্রভাবিত হয়। সরকার মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মানে মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে আরবরা বসবাস করেন সেখানেও মিডিয়ার ওপর কড়াকড়ি রয়েছে। এখানে বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই মুসলিমদের জন্য দেখানো হয়। এখন এইসব দেশের শাসকরা কীভাবে মুসলিম মিডিয়ার অবস্থানকে উন্নত করতে পারে?

আন্তর্জাতিক ভাষায় টিভি চ্যানেল দরকার

উত্তর : ইরানে তো শুধু মুসলিমদের জন্য চ্যানেল আছে, পাকিস্তানেও মুসলিমদের জন্য অনুষ্ঠান হয়। আরবি ভাষাতেও টিভি চ্যানেল রয়েছে। ভালো-মন্দ দুইই আছে। তবে তাদের অনুষ্ঠানগুলো শুধু আরবদের জন্য। আরবি ভাষায় যদি ভালো অনুষ্ঠান হয় সেটা ঠিক আছে। আমি বলছি না সেটা ভুল। যদি চ্যানেলগুলো ভালো হয়, যদি ইসলামি শরিয়াহ মেনে চলে। তবে এটাই যথেষ্ট নয়। আমার কথা হলো এমন একটা চ্যানেল শুরু করতে হবে যেখানে ভাষাটা হতে হবে আন্তর্জাতিক ভাষা।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমরা যেন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে দিতে পারি। পুরো বদলে দিতে পারি পৃথিবীর মানুষের মনোভাব। আরবি ভাষায় শুধু আরবদের সাথে ইসলামের ভালো কথাগুলো বলছেন, এটা অবশ্য ভালো কাজ। তবে আমাদের এমন চ্যানেল দরকার যেটার ভাষা হবে আন্তর্জাতিক ভাষা। আপনারা আরবের বিভিন্ন দেশ শাসন করছেন। তবে কেনো আপনারা ইংরেজিতে ইসলামিক চ্যানেল চালু করছেন না। যে চ্যানেলগুলো পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচার করবে। যে চ্যানেলগুলো সম্প্রচারিত হবে আমেরিকায়, ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে, এশিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে। এভাবেই আমরা মানুষের মনোভাব বদলাতে পারব। একই সাথে ইসলাম ধর্মকে প্রচার করতে পারব। যেটা ইসলাম অনুযায়ী ফরয।

banglainternet.com

প্রশ্ন : টিভিতে কার্টুন দেখা যাবে কিনা?

চাই ইসলামী ভাবধারার শিশু অনুষ্ঠান

উত্তর : জরীপ অনুযায়ী শিশুদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে যে জিনিসটা, সেটা স্যাটেলাইট চ্যানেল। আমেরিকাতে একটা শিশু প্রতিদিন প্রায় গড়ে সাত ঘন্টা টিভির সামনে বসে থাকে। স্কুলে এর চাইতে কম সময় থাকে। বেশির ভাগ চ্যানেলই তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যায়। এমনকি কার্টুন চ্যানেলগুলো। বেশির ভাগ চ্যানেলেই আপনারা বড় রকমের ভায়োলেন্স দেখবেন। আর একজন যদি প্রতিদিন এমন অনুষ্ঠানগুলো দেখে যা হত্যা, রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ নির্ভর, হোক সে কার্টুনভিত্তিক সিনেমা, তার প্রভাব খুবই মারাত্মক। এক্ষেত্রে বন্ধুর সাথে ঝগড়া হলে শিশুটি বাবার পিস্তল নিয়ে বন্ধুকে গুলি করে হত্যা করে।

মুম্বাইতে একটা সিরিয়াল দেখানো হতো বাচ্চাদের জন্য। অনেকটা কার্টুনের মতোই ছিল। নাম ছিল শক্তিমান। ঠিক সুপারম্যানের মতোই একটা বাচ্চা বাসায় উঁচু দালান থেকে লাফ দিল। সে ভেবেছিল যে শক্তিমান বা সুপারম্যান তাকে বাঁচাবে। কিন্তু কেউ তাকে বাঁচাল না। সে মারা গেল। যখন বাচ্চাটির বাবার সাথে কথা বলা হলো তখন তিনি বললেন, আমি ভাবতেই পারি নি আমার বাচ্চা লাফ দেবে। হয়তোবা আগামীকাল আপনার বা আমার বাচ্চা লাফ দিতে পারে। তাহলে এই মিডিয়ার প্রভাব এখন এতটাই বেশি যে এটা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। আর এতে সবচেয়ে ক্ষতি হয় বাচ্চাদের। সে জন্য আমি মুম্বাইতে একটা স্কুল চালু করেছি; যার নাম ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এই স্কুলে ভর্তির একটা শর্ত হলো আপনার বাড়িতে ক্যাবল টিভি থাকতে পারবে না। স্যাটেলাইট টিভি থাকবে না। লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে আপনার পিস টিভির কী হবে। এক নাম্বার কথা হলো পিস টিভি দেখার জন্য যদি আপনার ঘরে কয়েকশ শয়তানকে জায়গা দিতে হয়; কিছুই দেখা লাগবে না। সেটাই ভালো। বড় কোনো ক্ষতির চেয়ে ছোট ক্ষতি ভালো। কিন্তু যদি আপনার বড় কোনো ডিস থাকে আর ডিসে আপনি শুধু পিস টিভি দেখতে পান, অন্য কোনো চ্যানেল না। আমরা চেষ্টা করব, যাতে মধ্যপ্রাচ্যেও আপনারা দেখতে পারেন। একটা ডিস্ক দিয়ে, খরচ হবে মাত্র কয়েকশ রুপি বা কয়েকশ দিরহাম। মাসে মাসে দিতে হবে না। অন্য চ্যানেলগুলোতে যেভাবে দেন। হয়তো মাসে মাসে দুই বা আড়াইশ রুপি। খরচ করুন কয়েক হাজার রুপি। আর বিল্ডিং-এর সব বাসাতেই যেন দেখে। একটা ডিকোডার নেন সেটা দিয়ে শুধু পিস টিভি দেখবেন। অন্য কোনো চ্যানেল দেখবেন না। বর্তমানে যা আছে সেটাকে বাদ দিবেন না যে এটা হালাল কিংবা বলবেন না এটা হারাম। একটা সাবস্টিটিউট থাকতে হবে।

আমাদের স্কুলের অভিভাবকগণ ক্যাবল টিভি দেখেন না। তবে আমাদের সংগ্রহে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর পাঁচ হাজার ভিডিও ক্যাসেট আছে। যদি প্রতিদিন প্রায় তিন ঘন্টা করে একটি করে সিডি দেখেন তাহলে সব দেখে শেষ করতে আপনার প্রায় ১৩ বছরের বেশি সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে আপনার ছেলে বা মেয়ে স্কুল থেকে পাস করে চলে যাবে। আমাদের লাইব্রেরিতে আরো নতুন ভিডিও ক্যাসেট আসবে। তের বছরে আরো পাঁচ হাজার নতুন ভিডিও যুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই ইসলামি ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরিতে বাচ্চাদের জন্য কার্টুনও রয়েছে। তবে এগুলো ইসলামিক ভাবধারার। সেজন্য ভাই তোমাকে বলছি, তোমরা এমন কার্টুন দেখবে যেগুলো ইসলাম বিষয়ের ওপর নির্মিত, যেখানে কুরআনের কথা আছে, নবীজির হাদিসের কথা আছে। এমন অনেক কার্টুন আমাদের কাছে আছে। এই কার্টুনগুলো আমাদেরকে ইসলামের আরো কাছে নিয়ে আসবে। ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এছাড়া যে কার্টুন আছে– টম এন্ড জেরী, বাটম্যান, সুপারম্যান এগুলোর মধ্যে কোনো নীতিকথাই নেই। এগুলো আপনাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে এগুলোতে অনেক ভায়োলেন্স থাকে। এজন্য ইসলামিক কার্টুন দেখবেন। যেমন মুসলি ক্রাউট, এরকম আরো অনেক কার্টুন। যেমন ফতে সুলতান, যেগুলোতে একটা নৈতিক গল্প আছে। আর এগুলো তোমাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবে। যদি দেখতে হয় তাহলে ইসলামিক কার্টুন দেখবে। যেটা তোমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। তবে এমন কার্টুন দেখবে না, যেটা আল্লাহ থেকে বিমুখ করে।

প্রশ্ন : আমাদের নবী করীম (স)-এর সময়ে কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা খবর প্রচার করত, সেগুলোতে পরে ইসলামের উপকারই হয়েছে। আপনার কি এমনটা মনে হয় না যে এবারও একই ঘটনা ঘটবে?

ধর্ম সবসময় উপরে থাকে

উত্তর : আমরা জানি, আমাদের নবী করীম (স) এর সময়ে অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছিল। তাতে ইসলামের উপকারই হয়েছে। এটা সত্যি। আর আমরাও সব সময় সেটাই চাই। আমার মনে আছে, একবার আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে 'টেররিজম এবং জিহাদ' এর ওপর একটা লেকচার দিয়েছিলাম। আর স্বাভাবিকভাবে উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল। সেখানে উত্তরে আমি বলছিলাম যে, সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। একজন তরুণ যুবক, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আর বলল- 'জর্জ বুশের মৃত্যু হোক।' সবাই হাত তালি দিল। তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল–'জর্জ বুশের মৃত্যু হোক।' আর বিশ্বাস করুন একজন দা'য়ী হিসেবে আমার সব চেষ্টা বিফলে চলে গেল। আর আমি যখন উঠলাম, তখন বললাম– আমাদের নবীজি (স) এর সময়ে দু'জন উমর ছিলেন। তারা দুজনে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর নবীজি (স) আল্লাহর কাছে

banglainternet.com

দোয়া করলেন, অন্ততপক্ষে একজন উমরকে হিদায়াত কর। অতঃপর হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) মুসলিম হলেন। তাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব জর্জ বুশকে হিদায়াত দান করার জন্য। আমরা কেনো জর্জ বুশের মৃত্যু কামনা করব?

যদি সে ইসলামের ঘোরতর শত্রুও হয়; আর আল্লাহ বুশকে হিদায়াত দান করেন– তাহলে সে ইসলামের পক্ষ নিয়েই লড়াই করবে। তাই আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব জর্জ বুশকে হিদায়াত কর, তুমি নির্দেশনা দাও। আর যখন একথাটা বললাম, কোনো মিডিয়াই বলতে পারল না যে আমি যা বলেছি সেটা ভুল। তাই হিকমার সাথে উত্তর দিব। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করব তিনি যেন এ লোকগুলোকে হিদায়াত দান করেন। এভাবে ইসলাম ধর্ম সবসময়ই সবার উপরেই থাকবে।

প্রশ্ন : ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? অথচ রাসূল (সা) এর সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগের তেমন কোনো মাধ্যম ছিল না।

ইসলামী পদ্ধতিতে মিডিয়া ব্যবহার

উত্তর : ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন রাসূল (স) এর সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগের তেমন কোনো মাধ্যম ছিল না। তাহলে ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? আর কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি আছে কি না। ভাই একটা কথা বলি, ইবাদতের কথা যদি বলতে হয় সেটা বলা হয়েছে, যেটা ফরয সেটা হলো ইসলামি শরিয়াহ। অন্যান্য ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো হারাম। বাদবাকীগুলো হালাল। যেমন ধরুন, শূকরের মাংস খাওয়া হারাম, মদ খাওয়া হারাম। এমন কথা বলা না হলে হালাল। তাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, কুরআন বা হাদীসে এমন কোনো কথা কি বলা আছে যে আম খাওয়া হালাল? বলা না থাকলে কি আপনি বলবেন যে আম খাওয়া হারাম? তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো ফরয। এটা শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে। আর জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো বাদে বাকিগুলো হালাল। তা না হলে হয়তো আপনি বলবেন, ভাই জাকির আপনি আম খাচ্ছেন কেন? আমি আম পছন্দ করি। কারণ আমি ভারতীয়।

আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত। আর আমার দেশের আম নিয়েও গর্বিত। এখানে আপনি আমাকে পবিত্র কুরআন বা হাদীসের উদ্ধৃতি দেখান যে মিডিয়া হারাম। না, আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি। নবী করীম (স) কী করেছিলেন? তিনি চিঠি লিখিয়েছিলেন অমুসলিম রাজাদের উদ্দেশ্যে। যেমন আবিসিনিয়া, ইয়ামেন এবং পারস্যের রাজাকে। নবীজি (স) সেই চিঠিগুলোতে পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত উল্লেখ করেছিলেন–

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ـ

অর্থ : তুমি বল, হে কিতাবিগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলো, তোমরা সাক্ষী থাক অবশ্যই আমরা মুসলিম।

রাসূলে আকরাম প্রথমে চিঠিগুলো লিখিয়েছিলেন। এরপর ঘোড়ায় করে দূত মারফত বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিলেন। আজকের দিনের মার্সিডিজ গাড়ি অথবা জেট প্লেন তখন ছিল না। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। এটাই ছিল সেই সময়ের মিডিয়া। ভেবে দেখুন, প্রথমে তিনি চিঠিগুলো লিখিয়েছিলেন তারপর ঘোড়ায় করে সেগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছিলেন। নবীজি (স) তার সময়ের মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন। যদি আজকের দিনে নবীজি (স) বেঁচে থাকতেন 'আমার ধারণা' তিনিও আজকের এই মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করতেন, তবে সেটা ইসলামের শরিয়াহ মেনেই হতো। হারাম কোনো কিছু ব্যবহার করতে হতো না। হারাম কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহার করতে হবে হালাল উপায়ে। যেমন- একটা ছুরি এটি ভালো কাজেও ব্যবহার হতে পারে, আবার ব্যবহৃত হতে পারে খারাপ কাজেও। ছুরি ব্যবহার করা হারাম নয়।

তাই মিডিয়া আসলে হারাম নয়। যদিও বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা মিডিয়া হারাম। আমরা এখন এই মিডিয়াকে হালাল কাজে ব্যবহার করব। টেবিলটাকে উল্টে দিব। ইসলামি শরিয়ার নিয়মগুলো মেনে হালাল পদ্ধতিতে ব্যবহার করব। তখন হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে বলতে পারব ইসলাম প্রচার করার জন্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থে সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। কারণ ইসলাম প্রচার করাই আমাদের কাজ। সূরা জারিয়াত ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, এবং বোঝাতে থাকুন কারণ তা মুমিনদের উপকারে আসবে। তাহলে আমাদের উচিত আমাদের ইসলাম প্রচার করা। আর মানুষকে হিদায়াত করা, সেতো আল্লাহ তাআলার হাতে।

প্রশ্ন : হিন্দু অথবা অমুসলিম মিডিয়ায় উত্থাপিত প্রশ্ন বা বিতর্কের জবাব দেয়ার জন্য আমাদেরকে কি গীতা-বাইবেল ইত্যাদি পড়া উচিত?

banglainternet.com

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থও পড়তে হবে

উত্তর : হিন্দু বা অমুসলিম মিডিয়াকে উত্তর দেয়ার জন্য আমাদের গীতা– বাইবেল পড়া ইসলামে ঠিক ফরয নয়। এটা হলো মুস্তাহাব। আপনি পড়তে পারেন, কারণ

Contents

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেছেন–

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

অর্থ ঃ তুমি বল, হে কিতাবিগণ! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই।

এখন আমরা কীভাবে আসব যদি আমরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো না পড়ি। এজন্য অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত। তবে পড়া ফরয নয়। আমি বলব এটা মুস্তাহাব। এই কৌশলের কথা বলছেন আল্লাহ তাআলা ও আমাদের নবীজি (স)। আমাদের নবীজি (স) বলেছেন মাত্র একটা আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। এটা সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস।

আরো বলা হয়েছে আহলে কিতাবী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলেও কোনো সমস্যা নেই। তাহলে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়া হলো একটা কৌশল। যেটা দেখিয়েছেন আমাদের নবীজি (স)। আর পবিত্র কুরআনেও আছে, যদি এমনটা করতে পারেন তাহলে ভাল। খুবই ভালো। তবে এখানে আপনাকে বাইবেলের হাফিজ হতে হবে না। বেদের হাফিজ হতে হবে না। আপনাকে জানতে হবে দাওয়াহর জন্য কোন অনুচ্ছেদগুলো লাগবে। খুব বেশি সময় দেয়ার প্রয়োজন নেই। সময়টা কুরআনের পেছনে ব্যায় করুন। সময় নষ্ট করবেন না। এমনকি আমিও বাইবেলের হাফিজ নই। কুরআনেরও হাফিজ নই। কুরআনের হাফিজ হতে চাই। তবে এখনই নয়। বেদের হাফিজ নই বা ভগবতগীতারও হাফিজ নই। তবে আমি বেদের সেই অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো দাওয়ার কাজে লাগে। বাইবেলেরও সেই অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো সত্য প্রচারের কাজে লাগে। বাইবেলেরও সেই অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো মিশনারীরা বলে। ভাবতে পারেন অনেক মিশনারীদের চাইতেও বেশি জানি। আমি আসলে এই কৌশলটা শিখেছি শেখ আহমদ দিদাতের কাছ থেকে। তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করুন। তিনি হাজারও মুসলিম তরুণকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এমনকি আমাকেও। তাই আপনি সময় নষ্ট করবেন না। তবে আপনি সেই অনুচ্ছেদগুলো পড়বেন যেগুলো দাওয়ার কাজে লাগবে। আর তাদের কাছে বলবেন ইসলাম ধর্মের বাণী। যেখানে কুরআন বলেছে আমাদের সাদৃশ্যের কথা سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এভাবে আপনি কাজ করলে ইনশাআল্লাহ আপনি সহজে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবেন।

banglainternet.com

প্রশ্ন : দয়া করে বলবেন কি আপনাদের টিভি চ্যানেলে কী পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করা উচিত।

টিভি চ্যানেলে ব্যয় করুন

উত্তর : গড চ্যানেল হলো খ্রিস্টান চ্যানেলগুলোর সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেল। আপনি যদি প্রতি বছর এক পাউন্ড দেন, তাহলে সেটা দিয়ে তারা পাঁচটি ভাষায় গড চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করবে। তার মানে আপনি যদি বিশ পাউন্ড দেন তাহলে কথাটি দাঁড়ায় প্রতি বছর এক শ' ভাষায় প্রচার করবে। আপনি যদি দেন দুইশ পাউন্ড তাহলে প্রতি বছর এক হাজার ভাষায় প্রচার করবে। যদি আপনি এক হাজার ডলার দেন তাহলে তারা পাঁচ হাজার ভাষায় প্রচার করবে। এভাবে তারা প্রচার করে। আর গড চ্যানেল ভালোভাবেই চলছে।

মুসলিমরা এক সাথে এমন অনেক কাজ করে যেখানে তারা টাকা ইনভেষ্ট করে, তারপর সেখানে তারা মুনাফা করে এবং মুনাফার টাকা ভাগাভাগি করে নেয়। তবে পিস টিভির কথা যদি বলি, এই চ্যানেলটা কোন কমার্শিয়াল চ্যানেল নয়। অপনারা যদি এখানে ইনভেষ্ট করেন সেটার প্রতিদান পাবেন আখিরাতে। ইনশাল্লাহ কয়েক গুণ বেশি। আল্লাহতাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াতে বলেছেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ

অর্থ ঃ যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।

তার মানে শত গুণ বেশি লাভ। ব্যবসার ভাষায় বললে ৭০,০০০% লাভ। আল্লাহ তাআলা এখানে আরো বলেছেন তিনি বেশিও দিতে পারেন। তাহলে আপনারা যারা সাহায্য করবেন, ইনশাআল্লাহ আখিরাতে আরো বেশি পাবেন। আপনারা যা-ই দেন সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনি কতো দিয়েছেন তা আল্লাহর কাছে ধর্তব্য নয়। তিনি দেখবেন আপনি কত শতাংশ দিয়েছেন। একজন ধনী লোক যদি আমাকে অনেক টাকা দেয় ধরুন এক লক্ষ ডলার বা এক মিলিয়ন ডলার, এই ধনী লোকের

কাছে হয়তো তার এই টাকাটা তার সম্পদের এক শতাংশেরও কম। কোনো গরিব লোক দশ ডলার দিল। যেটা তার সম্পদের অর্ধেক। তাহলে সে বেশি সাওয়াব পাবে। আমাদের চ্যানেলটা চলবে আসলে আল্লাহর সাহায্যে। আমি যদি নাও দেই। আমি কিন্তু নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করি না। বিশ্বাস করুন, আমার কথায় জড়তা ছিল। যারা আমাকে ছোট বেলা থেকে চিনেন তারাও জানেন আমি তোতলা ছিলাম। কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম, জা-জা-জাকির। এ অবস্থা ছিল। আমি অবশ্য মুসা নবীর দোয়া পড়ি। তিনি তোতলা ছিলেন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ . وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ .

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তাহা : ২৫ আয়াত)

তাই এখানেও আসলে আমাদের আল্লাহর সাহায্য দরকার। আল্লাহ বিভিন্ন উপায়ে তার বান্দাকে সাহায্য করেন; আপনারা যত টাকা দেন না কেন? এখানে আমি আবারও বলব আল্লাহ সেটার শতাংশ পরিমাণ দেখেন। আমি আপনাদের বলব আপনারা টাকার পরিমাণ দেখবেন না। আপনি ঠিক করবেন যে আপনি যাকাত দেবেন এবং পাশাপাশি আপনার প্রতি মাসের শতকরা ২০% দেবেন পিস টিভিকে। ২৫%, ২০%, ৩০%। কেউ যদি দরিদ্র হয়ে থাকে সে হয়ত বলবে যে আমি সম্পত্তি দিয়ে দিব ২০%, সেটার পরিমাণ হতে পারে ১০০ ডলার। কিন্তু সে বিলিয়নার হলে সেই ২০% হতে পারে বিলিয়ন ডলার ,তখন তার হৃদয় ঠিক ঠিক এতো টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে, আপনার কাছে আরো ৮০% আছে। একজন ভালো ব্যবসায়ী এই পার্সেন্টেজ সেখানে দান করুন। এটা করলে আখিরাতে আপনাদের জন্য সুখবর থাকবে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনই ঠকাবেন না। আপনি সেরা পুরস্কারটাই পাবেন। তাই আপনারাই ঠিক করুন ২০%, ২৫%, ৩০% যত ইনকাম করব, তার এত পার্সেন্টিস যাকাতের পাশাপাশি আল্লাহর পথে খরচ করব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান দেবেন এই জীবনে এবং আখিরাতে। আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলাম আর মুসলিম সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে এটা আমরা সবাই জানি। তবে এটার চাইতেও খারাপ ব্যাপার হলো, কিছু মুসলিম দেশে এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের মিডিয়াতেও একই কথা বলা হচ্ছে। এখানেও মুসলিমদেরকে বলা হচ্ছে টেররিস্ট। হরহামেশা মুসলিমদেরকে কেনো এই অপবাদ দেয়া হচ্ছে?

মুসলিম মিডিয়াও বিভ্রান্ত হয়

উত্তর : দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিমদেশে তাদের চ্যানেলে মুসলিমদের ক্ষেত্রে টেররিস্ট শব্দ ব্যবহার করছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সেইসব মুসলিমদের প্রশ্ন করা উচিত। আর কিছু মুসলিম এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানে না বলে এই অভিযোগগুলো মেনে নেয়। যেমন ধরুন, এক মুসলিম আমাকে একবার বলেছিল তালেবানরা খারাপ। আসলে তিনি কিন্তু তালেবানদের শত্রু ছিলেন না। মাঝে মধ্যে মিডিয়াগুলো পরিকল্পিত অনুষ্ঠানের মাঝে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমরা যা শুনি, আমরা যা দেখি, তার সবকিছুই বিশ্বাস করি।

তাই একজন মুসলিম হিসেবে আমরা যেটা করব– সেইসব মুসলিমদের ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ জানাব। আর আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝাব যে, ইসলাম হলো সত্যের ধর্ম, ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। শুধু ইসলামের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলাম ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো ইসলাম। যার অর্থ নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।

প্রশ্ন : রাসুল (স)-এর হাদীস থেকে আমরা দাজ্জালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। এমন বেশ কিছু হাদীস আমাদের বলে যে, দাজ্জাল পৃথিবীর সব বাড়িই যাবে। সে তোমাকে এমন পানি দেখাবে যেটা পান করতে পারবে না। এমন আগুন দেখাবে যেটাতে তুমি পুড়বে না। আমরা কি টেলিভিশনকে এমন একটা দাজ্জাল বলতে পারি না?

মিডিয়া-দাজ্জালকে মুসলিম বানান

উত্তর : একটা সহীহ হাদিসে দাজ্জালের কথা বলা হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন, এই টেলিভিশনখানা আদ-দাজ্জাল, এক চোখের দাজ্জাল। Screen হলো এর একটা চোখ। তাই টিভি দাজ্জাল। এখন এই টিভিকে দাজ্জাল বলা যায় কি না? আমরা

banglainternet.com

আসলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে টিভিই হলো দাজ্জাল।

রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে কোনো ফাঁকা জায়গা রেখো না। ফাঁকা জায়গা পূরণ করো। যাতে শয়তান সেখানে দাঁড়াতে না পারে। সহীহ বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের কিতাবুল আযান-এর ৭৫ নং অধ্যায়ের ৬৯২ নং হাদীসে একথা বলা হয়েছে। এই হাদীসটা ছাড়াও আছে সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাত ২৪৫ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৬৬। যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও। ফাঁকা জায়গা পূরণ কর। যাতে শয়তান ঢুকতে না পারে। যদি আপনি মনে করেও থাকেন টিভি একটা দাজ্জাল, তাহলে সে দাজ্জালকে মুসলিম বানিয়ে নিন, এই মিডিয়ার প্রকৃতি পাল্টে দিয়ে। এটা দিয়ে ইসলাম প্রচার করা শুরু করে দিন। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে টিভি একটা দাজ্জাল। তবে আপনি যদি টিভিকে দাজ্জাল মনে করেও থাকেন, তাহলে আমরা কী করব? আমরা এই মিডিয়াকে ব্যবহার করব সত্য প্রচারের কাজে। যাতে আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা বলতে পারি যে আমরা ইসলাম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পুরো মানবজাতির কল্যাণের জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করেছি। এই পৃথিবীতে ইসলামের বাণী ছড়ানোর চেষ্টা করেছি।

ইসলামে নারী অধিকার সেকেলে নাকি আধুনিক

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : কেনো ইসলাম ধর্মে কোনো নারী নবী আসেনি?

পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই নবীর উপযুক্ত

উত্তর : যদি নবী বলতে আপনি বোঝেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে বাণী গ্রহণ করেন এবং যিনি মানবজাতির নেতা হিসেবে কাজ করেন; সেই অর্থে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ইসলামে আমরা কোনো নারী নবী পাইনি এবং আমি মনে করি, এটি সঠিক। কুরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে পুরুষ হলো পরিবার প্রধান। সুতরাং যদি পুরুষ পরিবারের প্রধান হয়ে থাকে তবে কীভাবে নারী সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব দেবে? এবার দ্বিতীয় অংশে আসি- একজন নবীকে সালাতের জামায়াতে নেতৃত্ব দিতে হয়। আমি ইতোপূর্বেই বলেছি নামাজে বেশ কিছু শারীরিক কসরত রয়েছে যেমন- কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি। যদি একজন নারী নবী নামাযে নেতৃত্ব দিতেন তবে জামায়াতের পিছনে যে সকল পুরুষ নামাজ পড়ে তারা এবং ইমাম উভয়ের পক্ষে এটি হতো বেশ বিব্রতকর।

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা যায়। যেমন একজন নবীকে সাধারণ মানুষের সাথে সবসময় দেখা সাক্ষাৎ করতে হয়। এটা একজন মহিলা নবীর পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কারণ ইসলাম নারী-পুরুষ পরস্পরের মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। যদি মহিলা নবী হতো এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যদি গর্ভবতী হতো, তবে তার পক্ষে কয়েক মাস নবুওয়াতের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না। তাঁর সন্তান হলে তার জন্য সন্তান লালন-পালন এবং নবুয়াতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে পিতৃত্ব এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা একজন মহিলার মাতৃত্ব

banglainternet.com

এবং নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করা থেকে তুলনামূলক সহজ। তবে যদি নবী বলতে আপনি এমন একজন ব্যক্তি বোঝেন যিনি আল্লাহর পছন্দের এবং যিনি পবিত্র ও খাঁটি ব্যক্তি, তবে সেখানে কিছু নারীর উদাহরণ রয়েছে। আমি এখানে উত্তম উদাহরণ হিসেবে বিবি মরিয়ম (আ)-এর নাম উল্লেখ করব। তার সম্পর্কে সূরা আল- ইমরানের ৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ যখন ফেরেশতা মরিয়মকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীদের উপর।'

যদি আপনি মনে করেন নবী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি মনোনীত এবং পরিশুদ্ধ, তবে আমরা বিবি মরিয়মকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যিনি ছিলেন যিশু খ্রিষ্ট বা ঈশা (আ)-এর মাতা। সূরা তাহরীমের ১১ নং আয়াতে আমাদের জন্য বলা হয়েছে,

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রী (আছিয়া)-এর অবস্থা বর্ণনা করছেন। ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া পর্যাপ্ত বিত্ত-বৈভবের মধ্যে থাকার পরও আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেছেন-

إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ ঃ হে আমার রব, আমার জন্য বেহেশতের মধ্যে আপনার সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ করে দিন, আর আমাকে ফেরআউন হতে এবং তার (কুফুরী) আচরণ হতে রক্ষা করুন, আর আমাকে সমস্ত অত্যাচারী লোক হতে হিফাজত করুন।

একটু ভেবে দেখুন তো, আছিয়া (আঃ) ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাট ফারাও-এর স্ত্রী এবং তিনি আল্লাহর ভালোবাসার জন্য নিজ আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে চেয়েছেন।

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইসলামে চার জন মহিলা নবী এসেছেন। তারা হলেন, বিবি মরিয়ম (আ), বিবি আছিয়া (আ), বিবি ফাতেমা (রা) ও বিবি খাদিজা (রা)। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : বহুবিবাহ কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলাদের জন্য উপকারী?

মহিলাদের মর্যাদা ও নিরাপত্তার স্বার্থে

উত্তর : যদি একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, তবে এটি মহিলাদের সংযত রাখতে সাহায্য করে। কারণ যদি প্রত্যেক পুরুষ একজন করে মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহিলা স্বামী খুঁজে পাবে না। তখন তাদের সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে আর তাহলো, হয় এমন একজনকে বিয়ে করা যার এক বা একাধিক স্ত্রী আছে, না হয় তারা 'পাবলিক প্রোপার্টি' হয়ে যাবে। অর্থাৎ, হয় সতীনের সংসার করবে, না হয় জনগণের সম্পত্তি অর্থাৎ পতিতা হয়ে থাকবে। তাই ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতি রয়েছে- তাদের সংযত রাখার জন্য, তাদের পাবলিক প্রোপার্টি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

প্রশ্ন : ইসলামে দত্তক নেয়া কি বৈধ?

দত্তক নেয়া বৈধ নয়

উত্তর : যদি দত্তক নেয়া বলতে আমরা বুঝি আপনি একজন বাচ্চা ছেলে গ্রহণ করেছেন, যে কিনা দরিদ্র শিশু এবং তাকে আপনার গৃহে থাকা, খাওয়া ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন; সেক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছে। কুরআনে বারবার বলা হয়েছে, তোমরা দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্য কর। আপনি এমন একজন শিশুকে পিতার আদর দিয়ে আপনার ঘরে পালন করতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ইসলামে বাধা হলো আপনি আইনগতভাবে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন না। তার নামের সাথে আপনার নাম সংযুক্ত করতে পারবেন না। আইনগত দত্তক নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো যদি কেউ এরকম দত্তক নেয় সেখানে বেশ কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়। প্রথমত শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সে তার পূর্ব পরিচিতি হারাবে। দ্বিতীয়ত, দত্তক নেয়ার পর আপনার নিজেরও সন্তান হতে পারে। তখন আপনি দত্তক শিশুটির থেকে নিজের সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারেন। তৃতীয়ত, যদি আপনার সন্তান জন্ম নেয় এবং দত্তক শিশুটি আপনার নিজের শিশুর বিপরীত লিঙ্গের হয়, তখন তারা পর্দা ব্যতীত একই বাসায় থাকতে পারবে না। কারণ তারা রক্ত সম্পর্কের ভাই-বোন নয়। যদি দত্তক শিশু মেয়ে হয় তাহলে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার বাবার সাথে পর্দা করতে হবে। কারণ সে তার রক্ত সম্পর্কের কন্যা নয়। আর যদি দত্তক শিশু ছেলে হয় এবং সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে তার কথিত মায়ের পর্দা করতে হবে এবং সে ছেলে যদি বড় হয় এবং বিয়ে করে তবে তার স্ত্রী ও তার কথিত পিতার মাঝে পর্দা থাকতে হবে। তাছাড়া আরো কয়েকটি কারণ রয়েছে- যদি আপনি দত্তক নেন, তবে আপনি আপনার আত্মীয়দের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন।

banglainternet.com

কারো পিতা যদি মারা যায় তবে তার যে পরিমাণ সম্পদই থাকুক না কেন, কুরআন বর্ণিত নিয়মানুসারে তা তাদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তার সন্তানও থাকে এবং তার দত্তক সন্তানও থাকে, সেক্ষেত্রে তার সন্তানগণ সম্পত্তির অংশ থেকে কিছু বঞ্চিত হবে। যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রী, তার মা রেখে মারা যায় যার কোনো সন্তান নেই, সেক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক। আর যদি তার সন্তান থাকে তবে সে পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ, যদি তার সন্তান না থাকে তবে সে পাবে এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু যদি তার দত্তক সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার ভাগের একটা অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং এই ধরনের জটিলতা নিরসনে ইসলাম সন্তান দত্তক নেয়া আইনত নিষিদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন : পুরুষরা জান্নাতে গেলে সুন্দরী কুমারীদেরকে 'হুর' হিসেবে পাবে। মেয়েরা জান্নাতে গেলে কী পাবে?

'বিশেষ কিছু' বা 'সাথী' (হুর) পাবে

উত্তর : পবিত্র কুরআনে কমপক্ষে চার জায়গায় 'হুর'-এর কথা বলা হয়েছে। 'হুর' এর কথা উল্লেখ আছে সূরা দুখানের ৫৪ নং আয়াতে, সূরা তূর এর ২০ নং আয়াতে, সূরা আর রাহমানের ৭২ নং আয়াতে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ২২ নং আয়াতে। অধিকাংশ অনুবাদে বিশেষ করে উর্দু ভাষায় 'হুর'কে সুন্দরী কুমারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও 'হুর' শব্দটি 'আহওয়ার' এবং 'হাওয়ার' এ দুটি শব্দের বহুবচন। 'আহওয়ার' পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং 'হাওয়ার' মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর 'হুর' শব্দটি বৈশিষ্ট্য বহন করে 'হাওয়ার'-এর। এ শব্দটি দ্বারা বড়, সাদা, সুন্দর চোখ এবং বিশেষত চোখের সাদা রং-কে বোঝায়।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় 'আযওয়াযুম মুতাহহারনা' বলে একই কথা বোঝানো হয়েছে। সূরা বাকারার ২৫ নং আয়াতে ও সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে- أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ "আযওয়াজুম মুতাহহারা"– অর্থ হলো সঙ্গী, সাথী। মুহাম্মদ আসাদ হুরের অনুবাদ করেছেন 'Spouse' বা বিপরীত লিঙ্গের সাথী আর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী করেছেন 'Companion' বা সঙ্গী হিসেবে। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হলো, সঙ্গী বা সাথী। পুরুষরা পাবে বড় বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট নারী আর নারী পাবে বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট সুদর্শন পুরুষ। আশা করি বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন : সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের বিপরীতে দুইজন নারী কেনো?

সকল ক্ষেত্রে একথা ঠিক নয়

উত্তর : দুই জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। ইসলামে সব সময় দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান নয়; শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে।

কুরআন শরীফে কমপক্ষে ৫টি আয়াতে পুরুষ অথবা মহিলার উল্লেখ ছাড়াই সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সূরা বাকারার ২৮২ নং আয়াতে দুই জন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ .

অর্থ : আর দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উপরোক্ত আয়াতটি কেবল অর্থনৈতিক বিষয়ে। এতে বলা হয়েছে ২ জন পুরুষের সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য। কেবল দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন কেউ অপারেশন করতে চায়। সাধারণত সে দুইজন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। যদি সে দুইজন দক্ষ সার্জন না পায়, তাহলে সে দুইজন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রি ডাক্তারের সহযোগিতাসহ একজন দক্ষ সার্জনের পরামর্শ নেবে। কারণ একজন সার্জন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের চেয়ে অপারেশনের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ। একইভাবে ইসলামে যেহেতু অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা পুরুষদের কাঁধে দেয়া হয়েছে, তারা মহিলাদের তুলনায় অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিক দক্ষ। এজন্যই অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষী রাখতে হবে।

সূরা মায়েদার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ .

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। এখানেও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অনেক বিচারক বলেন যে, যখন কোনো মহিলা খুনের সাক্ষাৎকার দেন, তখন তার নারী প্রকৃতি তাকে বাধা দিতে পারে এবং তিনি খুনের ঘটনাটি

banglainternet.com

নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। এজন্যই খুনের ক্ষেত্রেও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান রাখা হয়েছে। কেবল অর্থনৈতিক লেনদেন এবং খুনের সাক্ষ্য এ দুটি ক্ষেত্রে দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ এ বিষয়টির বিরোধিতা করে বলেন, যেহেতু কুরআনের সূরা বাকারার-২৮২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, সেহেতু সকল অবস্থায় সবসময়ই দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান।

চলুন আমরা পবিত্র কুরআনকে সামগ্রিকভাবে দেখি। সূরা নূরের ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ ـ

অর্থ ঃ যদি স্বামী অথবা স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং কোনো সাক্ষী না পায় তবে তাদের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।

এ আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। চাঁদ দেখার বেলায়ও একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিছু বিচারক বলেন, রমজানের শুরুতে একজন সাক্ষী এবং রমজানের শেষে দুইজন সাক্ষী দরকার, মহিলা অথবা পুরুষ যেই হোক না কেন। কিছু কিছু ব্যাপারে আবার পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কেবল মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন, একজন মহিলার মৃত্যুর পর তার গোসলের সাক্ষ্য কেবল মহিলারাই দিতে পারে। কেবল খুব বেশি সংকটের সময় মৃত মহিলার গোসলের ব্যাপারে স্বামী সাক্ষ্য দিতে পারেন। এখানে মহিলাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আশা করি।

প্রশ্ন : ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়ার কারণ কী? একজন পুরুষকে কেনো একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে?

বহু বিবাহের অনুমতি শর্তসাপেক্ষ

উত্তর : বহুবিবাহ অর্থ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বা পুরুষকে বিবাহ করা। যদি কোনো ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তবে তাকে বলা হয় 'বহুপত্নীক'। আর যদি কোনো মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে তাকে বলা হয় 'বহুপতি'। প্রশ্ন হচ্ছে কেনো ইসলামে একজন পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? কেনো ইসলামে 'বহুপত্নীক' বিবাহের অনুমতি দেয়া হল? অথচ কুরআনই পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, 'কেবল একজনকে বিয়ে কর'। অন্য এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যাতে বলা আছে 'কেবল একজনকে বিয়ে কর।' গীতা, বেদ,

banglainternet.com

রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল কোথাও বলা হয়নি 'কেবল একজনকে বিয়ে কর'. কেবল কুরআনেই আছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়লে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ রাজাদেরই একাধিক স্ত্রী ছিল- রাজা দশরথ, কৃষ্ণ, এদের ছিল একাধিক স্ত্রী।

এগার শতাব্দীতে ইহুদি আইনে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। কেবল রাব্বী গার্ডসাম বেঞ্জাছুদা একটি সিগনডরড (Signdord) প্রস্তাবে বলেন, 'বহুপত্নীক বিবাহ উঠিয়ে দেয়া উচিত।' ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে সেপট্রানিক ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসরাঈলের প্রধান রাবাইনাইট নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। খ্রিষ্টান বাইবেলে বহুপত্নীক বিবাহ অনুমতি দেয়া হয়েছে। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে চার্চ এটি নিষিদ্ধ করে। হিন্দু আইনেও একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি ছিল। ১৯৫৪ সালে যখন হিন্দু আইন পাস হয় তখন একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। 'ইসলামে মহিলাদের মর্যাদা' বিষয়ক এক কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৭৫ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৬,৬৭) মুসলমানদের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহের হার ৪.৩১ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৫.০৬।

চলুন পরিসংখ্যান বাদ দিয়ে আমরা মূল বিষয়ে আসি, কেন ইসলাম বহুপত্নী বিবাহের অনুমতি দিয়েছে? সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে আছে,

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ـ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থ ঃ তুমি তোমার পছন্দমতো মেয়েকে বিয়ে কর। দুটি, তিনটি অথবা চারটি কিন্তু যদি ন্যায়বিচার করতে না পার, তবে কেবল একজনকে বিয়ে কর।

এখানে 'কেবল একজনকে' বক্তব্যটি শুধু কুরআন শরীফেই আছে, অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে নেই। ইসলামপূর্ব যুগের আরবিয় পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকতো। কিছু কিছু লোকের শতাধিক স্ত্রী পর্যন্ত ছিল। ইসলাম একটি সীমা আরোপ করে দিয়েছে- সর্বোচ্চ চার। একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এই শর্তে যে, দুইজন, তিনজন অথবা চার জনের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং সমানাধিকার বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় কেবল একজন। সূরা নিসার ১২৯তম আয়াতে বলা হয়েছে– 'স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখা একজন পুরুষের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য কাজ।' তাই বহুপত্নীক বিবাহ ব্যতিক্রম। অনেকে এটাকে আইন হিসেবে ভেবে থাকলেও এটা আদতে কোনো আইন নয়। ইসলামে পাঁচ প্রকারের আদেশ এবং নিষেধ রয়েছে। প্রথম প্রকার হলো 'ফরয' বা 'আবশ্যকীয়'; দ্বিতীয় প্রকার

হলো 'উৎসাহমূলক', তৃতীয় প্রকার 'অনুমোদনযোগ্য' চতুর্থ প্রকার 'অনুৎসাহমূলক' এবং সর্বশেষ প্রকার হলো 'নিষিদ্ধ'। বহুপত্নীক বিবাহ হলো তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ 'অনুমোদনযোগ্য' আইন। কুরআন অথবা হাদীসের কোথাও এরকম কথা নেই যে, যে ব্যক্তি একজন স্ত্রী গ্রহণ করেছে তার চেয়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারী ভালো মুসলমান।

আসুন আমরা দেখি কেনো ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয়? প্রাকৃতিকভাবে ছেলে এবং মেয়ে সমানানুপাতে জন্ম নেয়। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মেয়েভ্রূণ ছেলেভ্রূণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী থাকে। ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশু অধিক প্রতিরক্ষা শক্তি পায়, মেয়ে শিশু শক্তিশালী এবং ভালোভাবে জীবাণু ও রোগের সাথে লড়াই করতে পারে। তাই ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশি। যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি নিহত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেও প্রায় পনেরো লাখ লোক নিহত হয়েছে- যার অধিকাংশ পুরুষ। পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, দুর্ঘটনায় মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা নিহত হয় বেশি।

ধূমপানের কারণেও মহিলাদের চেয়ে পুরুষের মৃত্যুহার অধিক। ফলে পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। ভারতেও পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি। প্রতিবছর এখানে ১০ লাখেরও বেশি মেয়েভ্রূণ হত্যা করা হয়। সে জন্য মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি। অন্যথায়, এই মেয়ে শিশুহত্যা বন্ধ করলে কয়েক দশকের মধ্যেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে। শুধু নিউইয়র্কেই পুরুষদের চেয়ে ১০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের চেয়ে মহিলা ৭৮ লক্ষ বেশি। সেখানে আড়াই কোটিরও বেশি সমকামী রয়েছে। তার মানে মহিলারা তাদের পুরুষ সঙ্গী পাচ্ছে না। শুধু ইংল্যান্ডেই পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৯০ লক্ষ মহিলা বেশি রয়েছে। আল্লাহই জানেন সারা বিশ্বে পুরুষদের চেয়ে কত কোটি মহিলা বেশি আছে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি প্রত্যেক পুরুষ একজন করে মহিলা বিয়ে করে তাহলে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ মহিলা অবিবাহিত থেকে যাবে, যারা বিয়ে করার মতো সঙ্গী পাবে না। ধরুন আমার বোন সেই ৩০ লক্ষের একজন, যে কখনো কোনো সঙ্গী পায়নি।এখন তার যে উপায়গুলো আছে তা হলো হয় সে এমন একজনকে বিয়ে করবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে, অথবা সে গণ-সম্পত্তিতে পরিণত হবে; তৃতীয় কোনো উপায় নেই। বিশ্বাস করুন! আমি এই প্রশ্নটি শত শত অমুসলমানের কাছে করেছি, তারা প্রথম উপায়টি বেছে

নিয়েছেন, একজনও ২য় টির পক্ষে রায় দেননি। কিছু লোক আছেন যারা বলেন, আমি আমার বোনকে কুমারী রাখাকেই ভালো মনে করব। এখানে স্মর্তব্য, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষ্যমতে কোনো পুরুষ অথবা মহিলা সারা জীবন কুমার বা কুমারী থাকতে পারে না। সারা জীবন অবৈধ যৌন সংসর্গ ছাড়া কুমারী থাকতে পারে না। কারণ প্রতিদিন শরীরে যৌন হরমোন তৈরি এবং নিসৃত হচ্ছে। যেসব সাধকেরা নিজেদের কুমার বলে দাবি করেন, হিমালয় পাহাড়ে যাবার সময় দেব-দেবীদের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যান, তারা কি কুমার? এক রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ডের চার্চের পাদ্রি এবং সন্ন্যাসিনীদের অধিকাংশই পাপাচার ও সমকামিতায় লিপ্ত। অন্য কোনো উপায় নেই, হয় এমন কাউকে বিয়ে করতে হবে যার ইতোমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে, অথবা পরিণত হতে হবে গণসম্পত্তিতে।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ অবস্থায় বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য?

নৈতিক ও সামাজিক কারণে অনুমোদনযোগ্য

উত্তর : কেবল একটি শর্ত রয়েছে যা পূরণ করলে কোনো ব্যক্তি একাধিক নারী বিয়ে করতে পারবে। আর তা হলো তাকে দুই, তিন অথবা চার জন স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখতে হবে। যদি সক্ষম না হয় তবে কেবল একটি বিয়ে করা উচিত। কিন্তু কিছু পরিস্থিতি আছে যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা একজন পুরুষের জন্য প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেয়। এদের মধ্যে একটি হলো– তুলনামূলক অধিক মহিলা, যারা স্বামী পাচ্ছেন না, তাদের নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য। আরো অনেক অবস্থা আছে, যদি একজন মহিলা বিয়ে করার পর দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধি হয়ে যায় এবং সে তার স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন স্বামীকে হয় প্রথম স্ত্রী রেখে আরেকটি বিয়ে করতে হবে অথবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে হবে।

মনে করুন, আপনার বোনের এরকম হলো অর্থাৎ প্রতিবন্ধি হয়ে গেল- আপনি কোনটিকে গ্রহণ করবেন? আপনার ভগ্নিপতি আপনার বোনকে তালাক না দিয়ে বিয়ে করুক- এটা আপনি কি চাইবেন? নাকি তালাক দিয়ে বিয়ে করুক এটা চাইবেন? ধরুন আপনার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার ফলে স্বামী ও সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারেনা। এমন পরিস্থিতিতে এটাই ভালো নয় কি যে সে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, যে তার সন্তান-সন্ততি ও অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করবে। কেউ হয়তো বলতে পারেন, পরিচারিকা রাখলেইতো হয়। আমিও তাদের সাথে রাজি আছি যে

banglainternet.com

পরিচারিকা রাখা যেতে পারে, সে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীকে দেখাশোনা করবে। কিন্তু আপনাকে দেখাশোনা করবে কে? তাই এটিই সঙ্গত হবে যে আপনি আরেকটি বিয়ে করবেন এবং দু'জনের প্রতি সমান ব্যবহার করবেন। এমনও হতে পারে যে, আপনার বিয়ের বেশ কিছু বছর পরও সন্তান হয়নি এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনই সন্তানের জন্য আগ্রহী। এক্ষেত্রে আপনার স্ত্রী আরেকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন এবং তারা সন্তান পেতে পারেন। কেউ কেউ বলতে পারেন, 'দত্তক গ্রহণ করলেইতো হয়'। অনেক কারণে ইসলাম দত্তক গ্রহণে অনুমতি দেয় না। ফলে দুটি উপায় থাকে– হয় আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিয়ে করতে হবে, অথবা প্রথম স্ত্রীকে রেখেই আরেকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

প্রশ্ন : মহিলারা কি রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন?

স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে পারেন না

উত্তর : পবিত্র কুরআন শরীফের কোথাও উল্লেখ নেই যে, একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না। এ বিষয়ে অনেক হাদিস আছে। এগুলোর একটি হলো- "যে সকল জনতা মহিলাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সফল হবে না।" কোনো কোনো চিন্তাবিদ এর মতে, 'এটি শুধু একটি বিশেষ সময়কে বুঝিয়েছে যার সাথে হাদীসটি সম্পর্কিত। বিশেষত, সে সময়টাকে নির্দেশ করেছে যখন পারস্য একজন রাণীকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।' অন্যরা বলেন, না, এটা সকল সময়কেই বুঝিয়েছে। এখন আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি একজন মহিলার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ঠিক কিনা। যদি ইসলামি রাষ্ট্রে মহিলা প্রধান হন, তবে তাকে নামাযের ইমামতি করতে হবে। যদি একজন মহিলা নামাযে ইমামতি করে তবে তাকে 'কিয়াম', 'রুকু' ও 'সিজদা' বা 'দাঁড়ানো', 'নত হওয়া' ও মাটিতে নত হওয়ার মতো বিভিন্ন কাজ করতে হয়। যদি পুরুষদের জামায়াতের সামনে কোনো মহিলা এগুলো করে, আমি নিশ্চিত যে, তা নামাযে ব্যাঘাত ঘটাবে। আজকের মতো আধুনিক সমাজে একজন মহিলা রাষ্ট্রের প্রধান হলে তাকে জনসভায় উপস্থিত থাকতে হবে, যেখানে পুরুষরাও উপস্থিত থাকে। অনেক সময় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে হয়, যেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে না এবং ইসলাম কোনো পুরুষের সাথে এরকম রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অনুমোদন দেয় না। অনেক সময় রাষ্ট্রপ্রধানকে অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে, যাদের অধিকাংশই পুরুষ, ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়, ছবি উঠাতে হয়, হ্যান্ডশেক করতে হয়- যা ইসলাম

অনুমোদন দেয় না। একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণ জনগণের সাথে মিশতে হয়। তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করতে হয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে, একজন মহিলার মাসিক চলাকালীন সময়ে যৌন হরমোন ইস্ট্রোজেন নিঃসরণের কারণে কতকগুলো আচরণগত, মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন দেখা যায়। এ পরিবর্তন অবশ্যই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞান আরো বলে, মহিলাদের পুরুষের তুলনায় অধিক কণ্ঠশক্তি ও মৌখিক শক্তি রয়েছে। অন্যদিকে পুরুষের রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা করার শক্তি- যা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর মেয়েদের মৌখিক দক্ষতা খুবই প্রয়োজনীয় তার মাতৃত্বের জন্য।

উল্লেখ্য, একজন মহিলা গর্ভবতী হতে পারেন এবং সে সময়ে তার কয়েকমাসের বিশ্রাম প্রয়োজন হতে পারে। এ সময়টিতে রাষ্ট্র পরিচালনার কী হবে? মা হিসেবে সন্তানদের দেখাশোনা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি একই সাথে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে বাস্তবিকভাবেই মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের পক্ষেই তা করা অধিকতর সম্ভব। সুতরাং, আমিও সেসব বক্তার অন্তর্ভুক্ত যারা বলেন, 'মহিলাদের রাষ্ট্র প্রধান করা উচিত নয়'। কিন্তু এর দ্বারা এটি বোঝায় না যে, মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তাদের মতামত প্রদান ও আইন প্রণয়ণে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলিম সম্প্রদায় সমস্যায় ছিল। তখন উম্মে সালমা (রা) রাসূল (স)-কে সমর্থন ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুতরাং অবশ্যই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন : ইসলাম মহিলাদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে কেনো তাদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখতে চায় এবং কেনো পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়?

ইজ্জত-আব্রু হিফাজত করতে

উত্তর : আমি পূর্বেই বলেছি যে, ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। কুরআনে 'হিজাব-এর কথা উল্লেখ আছে। তবে সেখানে নারীদের 'হিজাব- এর কথা বলার পূর্বে পুরুষদের হিজাবের কথাও বলা হয়েছে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

'একজন বিশ্বাসীর উচিত দৃষ্টি অবনত রাখা এবং তার পবিত্রতা সংরক্ষণ করা।'

banglainternet.com

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۔

'বিশ্বাসী মহিলাদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখ অবনত রাখে, পবিত্রতা সংরক্ষণ করে এবং সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত এবং ওড়না দ্বারা মাথা ও বুক ঢেকে রাখে।

বাবা, ছেলে ও স্বামী ছাড়া এবং গাইরে মাহরামদের একটি বিস্তারিত তালিকা কুরআন হাদিসে উল্লেখ আছে। আমরা জানি, যে সকল নারীকে বিবাহ করা পুরুষদের জন্য চিরস্থায়ী অথবা সাময়িকভাবে হারাম তাদেরকে মাহরাম (مَحْرَمَاتٌ) বলা হয়। নিম্নে উল্লেখিত ১৪ জন ব্যতীত সকলেই গায়েরে মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত।

মাহরামাত (مَحْرَمَاتٌ) মহিলা- ১. মা, ২.কণ্যা, ৩. বোন, ৪. ফুফু, ৫. খালা, ৬. ভাতিজী, ৭. ভাগ্নি, ৮. দুধ মা, ৯. দুধ বোন, ১০. শ্বাশুরী, ১১. স্ত্রীর পূর্বের কন্যা, ১২. ছেলে বউ, ১৩. দুই বোন একত্রে, ১৪. অন্যের স্ত্রী।

হিজাবের বৈশিষ্ট্যগুলোও অনুরূপভাবে কুরআন এবং হাদীসে দেয়া আছে। এর ছয়টি বৈশিষ্ট্য–

১ম বৈশিষ্ট্য : ব্যাপ্তি যা পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ভিন্ন। পুরুষকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং হাতের কব্জি ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেকে রাখতে হবে।

২য় বৈশিষ্ট্য : মহিলাদের কাপড় এমন টাইট হবে না যার ফলে দেহকাঠামো বোঝা যায়।

৩য় বৈশিষ্ট্য : কাপড় স্বচ্ছ হবে না।

৪র্থ বৈশিষ্ট্য : এরকম আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে।

৫ম, বৈশিষ্ট্য : এরকম পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের সাথে মিলের সৃষ্টি করে।

৬ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : অর্থাৎ, সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এমন পোশাক পরা যাবে না যা অবিশ্বাসীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে।

এবার প্রশ্নের উত্তরে আসছি- কেন ইসলাম পর্দায় বিশ্বাস করে এবং কেনো পুরুষ এবং মহিলাদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। চলুন, পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দুটি সমাজচিত্র বিশ্লেষণ করা যাক। যে দেশে সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয় সেটি হলো যুক্তরাষ্ট্র। এফ বি আই-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সেখানে ১২৫০ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। এটি হলো কেবল প্রতিবেদনের তথ্য। ধর্ষণের মাত্র ১৬% রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ধর্ষিতাদের প্রকৃত সংখ্যা হলো ৬,৪০, ০০০ জন মহিলা। সংখ্যাটিকে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করলে দেখা যায় ১৯৯০ সালে আমেরিকায় প্রতিদিন ১৭৫৬ জন মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়। ১৯৯১ সালে (১৯৯৩ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী) প্রতি মিনিটে ১.৩ জন নারী ধর্ষিত হয়েছে। আপনি জানেন, কেন? আমেরিকা মহিলাদের অধিক অধিকার দিয়েছে এবং তারা অধিক হারে ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৬% অভিযোগের মাত্র শতকরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় যার ৫০%-কে বিচারের আগেই ছেড়ে দেয়া হয়। মানে হলো ০.৮% ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ একজন একশত বিশটি ধর্ষণ করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা মাত্র ১ বার। ১২০টি ধর্ষণ করলে একবার মাত্র ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে কে না চেষ্টা করবে? আবার এরও অর্ধেক পরিমাণে মামলার শাস্তি ১ বছরেরও কম। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। নির্দেশনা হচ্ছে 'যদি ১ম বার ধরা পড়ে তবে তাকে সুযোগ দেয়া হোক এবং ১ বছরের কম শাস্তি দেয়া হোক।' এমনকি ভারতে, জাতীয় অপরাধ ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৯২ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত) প্রতি ৫৪ মিনিটে ১টি ধর্ষণের মামলা নথিবদ্ধ করা হয়। প্রতি ২৬ মিনিটে টিজিং-এর ১টি ঘটনা এবং প্রতি ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ১টি মামলা নথিবদ্ধ করা হয়।

এখন আপনি যদি ধর্ষণের মোট সংখ্যা হিসাব করেন, তাহলে দেখবেন প্রতি কয়েক মিনিটেই ১টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়। আমি একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। যদি যুক্তরাষ্ট্রের সকল মহিলা হিজাব পরে তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, বাড়বে, নাকি কমবে? যদি ভারতের সকল মহিলা হিজাব পরে, তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা বাড়বে, কমবে, নাকি অপরিবর্তিত থাকবে? ইসলামকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করা উচিত। যেখানে মহিলারা হিজাব পরতে এবং পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে এবং এর পরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাহলে তার মৃত্যুদন্ডকে আপনি বর্বর আইন বলতে পারেন কি?

banglainternet.com

অনেক ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞেস করেছি। ধরুন আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করা হলো। ইসলামী আইন, ভারতীয় আইন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের আইন বাদ দিন, আপনি বিচারক হলে আপনার বোনের ধর্ষককে আপনি কী শাস্তি দিতেন? সবাই বলেছেন, 'মৃত্যুদণ্ড'। কেউ কেউ বলেছেন, 'আমি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকব।' আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি ইসলামী শরিয়াহ আইন আমেরিকায় প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সমান থাকবে, নাকি হ্রাস পাবে? আসুন আমরা বাস্তবিকভাবে বিশ্লেষণ করি। যারা তাত্ত্বিকভাবে মহিলাদের অধিকার দিয়েছে, একই সৌন্দর্যের অধিকারী দুই বোন একজন হিজাব পরিহিতা অন্যজন শর্ট স্কার্ট পরিহিতা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, রাস্তায় বসা মাস্তানেরা কাকে উত্যক্ত করবে? নিঃসন্দেহে শর্ট স্কার্ট পরিহিতাকে। সত্যিকার অর্থেই হিজাব মহিলাদের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং পবিত্রতা সংরক্ষণ করে।

প্রশ্ন : ইসলাম মুসলিম পুরুষদের আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের কেনো আহলে কিতাব পুরুষদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি? আহলে কিতাব মহিলারা কি মুশরিক নয়?

জন্ম ও বংশ পরিচিতি অক্ষুণ্ন রাখতে

উত্তর : মুসলিম পুরুষদের কিতাব মহিলা বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীত মহিলাদের আহলে কিতাব পুরুষ বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে সূরা মায়েদার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ .

অর্থ ঃ আহলে কিতাবদের যেসব মহিলা বিশ্বাসী এবং সতী, তাদেরকে তোমাদের জন্য বিয়ে করা বৈধ করা হয়েছে।

ইসলাম এ কারণে এ অনুমতি দিয়েছে যে, যদি কোনো আহলে কিতাবের মহিলারা কোনো মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে তার স্বামীর পরিবার তাকে তার নবীদের সম্পর্কে অপমানমূলক কিছু বলবে না বা করবে না। কারণ, মুসলমানগণ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সকল নবীর ওপর বিশ্বাস করে। যদি তাদের সম্প্রদায়ের কোনো মহিলা আমাদের পরিবারে আসে তবে সে উপহাসের পাত্র হবে না। কিন্তু এর বিপরীতে কোনো মুসলিম মহিলা যদি তাদের পরিবারে যায় তবে সে উপহাসের পাত্র হবে। এছাড়াও সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে আছে–

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ .

banglainternet.com

অর্থ ঃ অবিশ্বাসী মহিলা বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এমনকি একজন বিশ্বাসী দাসীও অবিশ্বাসী নারীর চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাকে আকৃষ্ট করে। আবার সূরা মায়েদার ৭২ নং আয়াত বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ .

অর্থ ঃ যারা বলে, মরিয়মের সন্তান মসীহ আল্লাহর সন্তান, তারা কুফরী করছে।

সুতরাং, কুরআন বলছে, আপনি আহলে কিতাবের অনুসারীদের বিয়ে করতে পারেন। যারা বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাস করে না খ্রিষ্ট প্রভু অথবা প্রভুর ছেলে কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তিনি আল্লাহর দূত তাদেরকে বিয়ে করা যাবে।

প্রশ্ন : ইসলাম কেনো বিবাহিত ও অবিবাহিত মহিলাদের উইল করতে অনুমতি দেয় না?

মেয়েরা উইল করতে পারে

উত্তর : ইসলাম মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে পশ্চিমাদের ১৪০০ বছর আগে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো নারীর, হোক সে বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত, কোনো পরামর্শ ছাড়াই সম্পদের মালিক হওয়া বা পরিত্যাগ করার অধিকার আছে। ইসলাম তাকে দান (উইল) করার অধিকার দিয়েছে।

প্রশ্ন : বলা হয়, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে সমানাধিকার দিয়েছে। তাহলে কেনো নারীদেরকেও চার বিয়ের অনুমতি দেয়া হলো না? পুরুষরা পারলে মহিলারা কি চারটি বিয়ে করতে পারে না?

সৃষ্টি-প্রকৃতি মেয়েদের অনুকূল নয়

উত্তর : প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিক যৌনশক্তি সম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষ জৈবিকভাবে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে, কিন্তু একজন স্ত্রী একাধিক স্বামীর চাহিদা সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে পারে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মাসিকের সময় মহিলারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই সময় প্রায় ঝগড়া হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাদের এক অপরাধ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেখানকার মহিলাদের অধিকাংশ ঋতুবর্তীকালীন সময়ে অধিক অপরাধ করে থাকে। ফলে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে তার পক্ষে সমন্বয় করা কষ্টকর।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, কোনো মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে তার যৌন রোগের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, যা একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে হয় না। যদি

কোনো ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের পিতা এবং মাতা সনাক্ত করা খুবই সহজ। অন্যদিকে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে আপনি কেবল মাকে সনাক্ত করতে পারবেন, বাবাকে সনাক্ত করা মুশকিল হয়ে যাবে। ইসলাম বাবার সনাক্তকরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'যদি কোনো সন্তান তার বাবার পরিচয় না পায় তাহলে সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে। বহুপতি বিবাহ নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে যেমন অনেক কারণ আছে, অপরদিকে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতির পক্ষেও অনেক যুক্তি আছে।

কোনো দম্পতির যদি সন্তান না থাকে তবে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। ধরুন যদি পুরুষ বন্ধ্যা হয়, তবে কি স্ত্রী একাধিক স্বামী বিয়ে করতে পারে? না-পারে না। কারণ, কোনো ডাক্তারই শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে স্বামী বন্ধ্যা। এমনকি শুক্রকীটবাহী নাড়ীচ্ছেদ করলেও কোনো ডাক্তার বলতে পারবে না সে পিতা হতে পারবে না। সুতরাং সন্তানের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অন্যদিকে ধরুন স্বামী দুর্ঘটনায় পতিত হলো অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হলো তখন কি স্ত্রী অন্য স্বামী নিতে পারবে না?

চলুন আমরা ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করি। যদি স্বামী দুর্ঘটনায় পতিত হয় অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়, তাহলে সে তার দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ। প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক- সে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট নাও করতে পারে। প্রথমটির জন্য ইসলাম যাকাতের ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয়টির জন্য, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষ্য মতে স্ত্রীর তুলনায় স্বামীর সন্তুষ্টি আসে খুবই কম। কিন্তু স্ত্রী যদি চায়, তবে সে তালাক গ্রহণ করতে পারে। তালাক গ্রহণ উত্তম যদি সে স্বাস্থ্যবতী হয়ে থাকে। অন্যথায় যদি সে স্বাস্থ্যবতী না হয় অথবা প্রতিবন্ধী হয়, তবে কে তাকে বিয়ে করবে?

প্রশ্ন : যদি কোনো মেয়ে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে সে 'না' বলতে পারে। কিন্তু সে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। তারা তাকে খেতে দিচ্ছে, দেখাশোনা করছে। 'না' বলার পর কি সে নিরাপদে জীবনধারণ করতে পারে?

অবশ্যই নিরাপদে থাকবে

উত্তর : কেন পারে না? বিয়ের পূর্বে তার ভরণপোষণসহ সকল দায়িত্ব তার পিতার ও ভাইদের। যদি সে 'না' বলে, তবে তার পিতা ও ভাইদের দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে। সে খুব জোড়ালোভাবেই 'না' বলতে পারে।

প্রশ্ন : ইসলাম, হিন্দু, খ্রিষ্টান যাই হোক না কেনো, সব ধর্মগ্রন্থেই অনেক ভালো বিষয় আছে। কিন্তু হাজার বছর পরে ধর্মের চর্চা হলেও মানুষ নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। কোনো ধর্মই এর ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রশ্ন হলো, ধর্ম গ্রন্থগুলোতে যা লিখা আছে– বাইবেল, কুরআন অথবা গীতা যাই হোক না কেনো, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজে চর্চা করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি অনুশীলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে কী লেখা রয়েছে তার ওপর কি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়? এ বইয়ে কী লেখা আছে, ওই বইয়ে কী লেখা আছে তা বলার চেয়ে কী করা যেতে পারে সেটা বলা দরকার।

তত্ত্বকথা অনুযায়ী অনুশীলন উত্তম

উত্তর : সকল ধর্মগ্রন্থই ভালো কথা বলে। কিন্তু আমাদেরকে তত্ত্বীয় কথাবার্তা অনুযায়ী চর্চার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে–আমিও তার সাথে একমত। অধিকাংশ মুসলিম সমাজ কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আমরা এখানে লোকদেরকে কুরআন-সুন্নাহর নিকটবর্তী হতে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশ্নের প্রথম অংশ, যেখানে বলা হয়েছে সকল ধর্মগ্রন্থই ভালো কথা বলে। তাই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলা অনর্থক - আমি আপনার সাথে একমত নই। 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা' বিষয়ে আমি একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি ইসলামে নারীর মর্যাদাকে অন্যান্য ধর্মে প্রদত্ত নারীর মর্যাদার সাথে তুলনা করেছি এবং আপনি যদি আমার বক্তব্য শুনে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন কোন ধর্ম নারীদের অধিক মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি আপনি যদি একমত হন যে তত্ত্বীয়ভাবে ইসলাম সবচেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে, তাহলে আমাদেরকে এখন তা অনুসরণ করতে হবে।

ইসলামের কিছু দিক লোকজন অনুসরণ করছে এবং কিছু দিক করছে না। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীস থেকে দূরে সরে গেলেও সৌদি আরব ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করছে। আমাদেরকে যা করতে হবে তা হলো, ফৌজদারি শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে সৌদি আরবের বাস্তব উদাহরণ গ্রহণ করতে হবে এবং যদি প্রয়োজনীয় হয় তাহলে সমগ্র বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর অন্য সমাজে যেখানে সামাজিক জীবনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ আছে, সে সমাজ পরীক্ষা করতে হবে। যদি তা সর্বোত্তম হয়, তাহলে তা অন্যান্য সমাজে বাস্তবায়ন করতে

banglainternet.com

হবে। কারণ ইসলামি আইন হলো সর্বোত্তম আইন। যদি আমরা এর অনুসরণ না করি তবে আমরা নিজেরা দোষী, ধর্ম নয়। এজন্যই আমরা মানুষকে ডেকেছি, যেন তারা কুরআন-হাদীসকে যথাযথভাবে বুঝতে পারে এবং তার অনুশীলন করতে পারে।

প্রশ্ন : আমরা জেনেছি, একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী তালাক প্রদান করে তবে তার 'ইদ্দত' পর্যন্ত তার স্বামী তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু তারপর তার বাবা মা তার ভরণ-পোষণ দেবে। কিন্তু যদি তারা সক্ষম না হয় তখন মেয়েটি কী করবে?

স্বজন ও সমাজ দায়িত্ব নেবে

উত্তর : যদি কোনো মহিলাকে তার স্বামী তালাক প্রদান করে তখন স্বামীর দায়িত্ব যে ইদ্দতকালীন পর্যন্ত, তার স্ত্রীকে ভারণ-পোষণ করবে, যে সময়টা হয় ৩ মাস বা তার বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত। ঐ সময়ের পর তাকে ভরণ-পোষণ করার দায়িত্ব তার পিতা বা ভাইদের। যদি তার বাবা বা ভাইয়ের সামর্থ্য না থাকে তবে তার নিকটাত্মীয়দের উচিত তার দেখাশোনা করা। যদি তাদেরও সামর্থ না থাকে তবে এ দায়িত্ব এসে পড়ে মুসলিম উম্মাহর ওপর। তাই আমাদের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং যাকাত সংগ্রহ করে এ ধরনের মহিলাদের দেখাশোনা করতে হবে। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে এটি ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের দেখাশোনা করা।

প্রশ্ন : যতটুকু জানি, ইসলামে নারী-পুরুষ সমান। কিন্তু কেনো উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়নি?

ন্যায়সঙ্গত অংশীদার করা হয়েছে

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাবের নির্দেশনা পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১১ এবং ১২ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে। কীভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বন্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের সূরা নিসার ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ

banglainternet.com

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ পাওয়া) সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন- পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু কন্যা থাকে দুইয়ের অধিক, তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তবে সে অর্ধাংশ পাবে, আর পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে, যদি মৃতব্যক্তির কোনো সন্তান থাকে। আর যদি ঐ মৃত ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে এবং পিতা মাতাই তার ওয়ারিশ হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে তবে তার মা পাবে এক ষষ্ঠাংশ।

একই সূরার ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

অর্থ ঃ আর তোমরা অর্ধেক পাবে ঐ সম্পত্তির যা তোমাদের স্ত্রীগণ রেখে যায়, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি ঐ পত্নীগণের কোন সন্তান থাকে তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তোমরা এক চতুর্থাংশ পাবে ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। আর তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে এক চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি কোনো সন্তান থাকে তবে তোমাদের কৃত ওসিয়াত বা ঋণ আদায় করার পর তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ পাবে।

অতএব, সংক্ষেপে বলা যায়, অধিকাংশ সময়ে মহিলারা তার পুরুষ সমশ্রেণীর বিপরীতে অর্ধেক সম্পত্তি পায় কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণস্বরূপ বৈপিত্রেয় ভাই বোনের ক্ষেত্রে উভয়েই পাবে সমান এক ষষ্ঠাংশ, যদি তার আপন ভাই না থাকে। যদি মৃতব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে তবে তার বাবা মা উভয়েই সমান এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সন্তান-সন্ততি না রেখে যদি একজন মহিলা মৃত্যু বরণ করে, সেক্ষেত্রে তার স্বামী পাবে অর্ধেক। তার মা পাবে এক তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাবে এক ষষ্ঠাংশ। এ থেকে বোঝা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলাগণ তার সমশ্রেণির পুরুষ থেকে দ্বিগুণ পায়। যেমন উল্লিখিত ব্যাপারে পিতার চেয়ে মাতা দ্বিগুণ পায়। তবে আমি আপনার সাথে একমত যে,

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাগণ পুরুষের অর্ধেক পায় যখন নারীটি স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই, যেহেতু পুরুষ পরিবারের আর্থিক সংস্থাপনের জন্য দায়বদ্ধ এবং যেহেতু আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করতে পারেন না, তাই তিনি নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশি পরিমাণ অংশ নির্ধারিত করেছেন। তা না হলে আমাদেরকে 'ইসলামে পুরুষদের অধিকার' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হতো।

আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি– মনে করুন একজন লোক ইন্তেকাল করল এবং সে ইন্তেকাল করার পর তার সম্পত্তি তার এক ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে বিতরণ করা হলো, যার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। ইসলামী শরীয়াহ মতে, তার ছেলে পাবে ১ লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু ছেলের পাওয়া ১ লক্ষ টাকা থেকে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ, এখন সংসারের জন্য ব্যয় করতে হবে তা হতে পারে ৭০ বা ৮০ বা ৯০ হাজার টাকা। কিন্তু মেয়েটিকে তার পরিবারের দেখাশোনার জন্য ১ টাকাও খরচ করতে হবে না। আমার মনে হয় এখন ব্যাপারটি সকলের কাছে পরিষ্কার যে, কেন ইসলামে পুরুষকে নারীদের তুলনায় বেশি অংশ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : ইসলাম কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ অনুমোদন করে না, এটি কি ইসলামে আধুনিকতা নাকি সেকেলে ধারণা?

এটি ভারসাম্যপূর্ণ আধুনিক ব্যবস্থা

উত্তর : যদি আপনি 'আধুনিকতা' বলতে বুঝেন আপনার স্ত্রী বা বোনকে আপনি পণ্যদ্রব্য বানাবেন যাতে তারা অন্যদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে পারে অথবা আপনি তাকে 'মডেলিং' পেশায় নিয়োগ করবেন, সেক্ষেত্রে ইসলাম সেকেলে বলেই আমার কাছে মনে হবে। কারণ ওয়েষ্টার্ন মিডিয়াতে নারীদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা মহিলাদের অধিক স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে, তারা তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণই করেছে।

এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মক্ষেত্রে যায় এমন নারীদের ৫০% ধর্ষণের শিকার হয়। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন ৫০%! কিন্তু কেন? কারণ হলো ওখানকার অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। এখন আপনি যদি মনে করেন একজন মহিলার ধর্ষিতা হওয়া 'আধুনিকতা' তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম 'সেকেলে'। আর যদি আপনি বলেন না, তবে ইসলাম অতি আধুনিক।

প্রশ্ন : মহিলাগণ কি এয়ারহোস্টেস হিসেবে চাকরি করতে পারবে? যেহেতু এটি শালীন ও অধিক বেতনের চাকরি?

শালীনতার প্রশ্নে সঙ্গত নয়

উত্তর : আমি আপনার সাথে একমত যে এটি খুব উচ্চ বেতনের চাকরি। কিন্তু এটি শালীন চাকরি কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। সাধারণত এয়ার হোস্টেস হিসেবে ঐ সব মহিলাদের বাছাই করা হয় যারা সুন্দরী। আপনি কখনো অসুন্দর বা কুশ্রী মেয়ে সেখানে খুঁজে পাবেন না। তদুপরি তাদেরকে হতে হবে তরুণী ও আকর্ষণীয়া। তাদেরকে এমন পোশাক পরতে হয় যা সাধারণত ইসলামি মূল্যবোধের পরিপন্থী। তাদেরকে এমনভাবে অঙ্গসজ্জা করতে হবে যাতে যাত্রীরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এয়ার হোস্টেসদেরকে যেসব যাত্রীদের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়, তাদের অধিকাংশই হলো পুরুষ যেখানে তাদের মধ্যে সান্নিধ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা এয়ার হোস্টেসদের সাথে গল্প করে। এয়ার হোস্টেস পছন্দ না করলেও তাকে তার কথার উত্তর দিতে হয়। অন্যথায় তার চাকরি হুমকির মুখে পড়ে। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা বলে 'ম্যাডাম অনুগ্রহ করে আমার সিট বেল্ট বেঁধে দিন।' এখানে কী ঘটছে? এখানে বিপরীতমুখী দুই লিঙ্গের মধ্যে তৈরি হচ্ছে অন্তরঙ্গতা বা নৈকট্য।

আবার অনেক এয়ারলাইন্সে মদ সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকে এয়ার হোস্টেসদের। ইসলাম মদ পান বা সরবরাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আর এসব কাজের জন্যই কেবল নারীদেরকে এয়ার হোস্টেস হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ঐ বিমানে অন্য পুরুষ কর্মচারী থাকলেও তাদেরকে এসব কাজে নিয়োজিত করা হয় না। তারা সাধারণত ব্যস্ত থাকে রান্নার কাজে। প্লেনে এ ধরনের বিপরীতমুখী কাজের ঘটনা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাস করুন, একটা বিমানও মহিলা কর্মচারী ছাড়া চলে না। শ্রেষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্র সৌদি আরব কর্তৃক পরিচালিত 'সৌদি এয়ারলাইন্স'ও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে সৌদি মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হয় না বা পাওয়া যায় না। ফলে তাদেরকে বিদেশ হতে এয়ার হোস্টেস আমদানি করতে হয়। এটি সৌদি ইসলামি রাষ্ট্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তবে তাদের কাছে কোনো বিকল্প নেই।

এয়ারলাইন্স সমূহে যাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য মহিলা এয়ার হোস্টেস রাখতে হয়। এয়ারলাইন্স সংস্থায় কতিপয় নিয়ম রয়েছে যা শুনলে আপনি অবাক হবেন।

banglainternet.com

উদাহরণস্বরূপ 'এয়ার ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স' এর নির্দেশনা আছে যে, 'এয়ার হোস্টেস নির্বাচিত হওয়ার পর চার বছর পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে না'। কিন্তু এয়ারলাইন্স বলে, 'তুমি যদি গর্ভবতী হও তবে তোমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে'। কল্পনা করুন! কিন্তু এয়ারলাইন্স বলে 'তোমার অবসর বয়সসীমা ৩৫ বছর'। কিন্তু কেন? কারণ তুমি আর তখন যথেষ্ট আকর্ষণীয় নও। আপনি কি এটাকে শালীন চাকরি বলতে পারবেন?

প্রশ্ন : ইসলামে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়েছে কি?

ইসলাম সহশিক্ষার অনুমতি দেয়নি

উত্তর : সহশিক্ষা বলতে যদি আপনি বোঝেন একই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে একই সাথে পড়া, তবে প্রথমত আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি এমন প্রতিষ্ঠান নিয়ে যেখানে ছেলে এবং মেয়ে একই স্কুলে পড়াশুনা করে। 'The World This Week' নামক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে সহশিক্ষা ও একক শিক্ষা দানকারী স্কুলের ওপর জরিপ চালানো হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো এবং জরিপকারীদের মতে একক শিক্ষা দানকারী স্কুল সহশিক্ষা দানকারী স্কুলগুলো থেকে অনেক দিক থেকে ভালো বিবেচিত হয়। শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হলে তারা বলেন, একক শিক্ষাদানকারী স্কুলগুলোর ছাত্ররা সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্রদের থেকে অনেক বেশী মনোযোগী হয়ে থাকে। কিন্তু ছাত্রদের অভিমত হলো, তারা সহশিক্ষাই পছন্দ করে এবং আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, এর কারণ কী? জরিপ থেকে স্পষ্টত দেখা যায়, সহশিক্ষা প্রদানকারী স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা বিপরীত লিঙ্গের নিকট জনপ্রিয় হওয়ার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে থাকে।

আরো বলতে হয়, পড়াশুনায় মনোযোগ না থাকলেও ক্লাসে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য তারা খুব স্মার্টভাবে শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারা স্কুলে পড়াশুনা করার চেয়ে ডেটিংয়ে অনেক বেশি সময় ব্যয় করে। জরিপের সর্বশেষে দেখা যায় যে, যুক্তরাজ্য সরকার অধিক হারে একক শিক্ষা দানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করছে। আমেরিকার এ ধরনের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে- মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ক্লাসমেটের কাছ থেকে নিষিদ্ধ যৌন শিক্ষা বা কৌশল শিখতে বেশি সময় ব্যয় করে। ভারতেও প্রতিনিয়ত কমবেশি এমন ঘটনা ঘটছে।

চলুন, আমরা এবার সহশিক্ষা দানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করি। আলোচ্য রিপোর্টে স্কুল সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে ঐ একই কাজগুলো কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। ১৯৮০ সালের ১৭ মার্চ 'নিউজ উইক'-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারীদের ওপর কী পরিমাণে যৌন আক্রমণ হয়েছে। এ রিপোর্টের প্রধান দিক হলো "অধ্যাপক ও প্রভাষকরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো গ্রেড পয়েন্টের প্রলোভন দেখিয়ে যৌন হয়রানি করে। ফলে শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ কমে যায় এবং শিক্ষার মানও নিচে নেমে যায়। এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে যেটি পত্রিকার শিরোনামে পর্যন্ত স্থান পেয়েছিল। আমি কলেজটির নাম ভুলে গেছি, যেখানে একটি মেয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য দিবালোকে ৪/৫ জন কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে- যেটি 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এও প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, আমেরিকার স্কুল ও ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে ধর্ষিতা হয় ২৫% ভাগ।

আমার মূল প্রশ্ন হলো- এখানে আপনি কি আপনার সন্তানকে স্কুল-কলেজে পাঠাবেন পড়াশুনার জন্য? নাকি তাদেরকে পাঠাবেন যৌন কৌশল শিক্ষার জন্য নয়তো যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার জন্য? যদি প্রথমটি হয় তবে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব সহশিক্ষায় ভর্তি না করানোর জন্য, আর যদি পরেরটি হয় তবে আপনি কি করবেন আপনিই ভালো বুঝবেন।

প্রশ্ন : কুরআন ও হাদীস ব্যাখ্যাদান করার মতো কতজন মহিলা বর্তমানে আছেন এবং পুরুষদের তুলনায় তারা কত শতাংশ?

নারী আলেম তৈরি হচ্ছে

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সময় এমন অনেক মহিলা ছিলেন যারা কেবল হাদীস ব্যাখ্যাই করতেন না, তারা সেগুলো মুখস্থও করতেন। হযরত আয়েশা (রা) নিজে ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখন প্রধান প্রশ্ন হলো, বর্তমানে কতজন নারী 'আলেম' আছেন এবং জনমিতিতে এর শতকরা হার কত? মুম্বাইতে অনেক মহিলা আলেম রয়েছেন এবং অনেক মুসলিম সংগঠনও রয়েছে, এমনকি দারুল উলুম নদওয়াতেও। অন্যান্য জায়গাতে যেমন মুম্বাইর 'ইসলাহ-উল-বানাত'-এ অনেক মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা নারী আলেম তৈরি করেন। তাদের শতকরা হার আমি জানি না, তবে সংখ্যায় তারা শত শত।

banglainternet.com

প্রশ্ন : কেবল স্বামীই কি স্ত্রীকে 'তিন তালাক' বলতে পারে? যদি কোনো নারী তালাক বা 'ডিভোর্স' নিতে চান তবে তাকে কী করতে হবে?

ইসলামে ডিভোর্সের প্রকারভেদ আছে

উত্তর : বোনের প্রশ্নের মূল বিষয়টি হলো একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারে, কিন্তু একজন নারীও কি তার স্বামীকে ডিভোর্স বা তালাক দিতে পারে কিনা? একজন মহিলা তালাক দিতে পারে না। 'তালাক' শব্দটি আরবি যেটা 'ডিভোর্স' অর্থে ব্যবহার করা হয়, যা স্বামী তার স্ত্রীকে দিতে পারে, স্ত্রী-স্বামীকে দিতে পারবে না। ইসলামে ডিভোর্স পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত ঃ চুক্তির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বলবে ব্যাস আমরা আর একসাথে ঘর করার মতো উপযুক্ত নই- চলো, আমরা উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দেই।

দ্বিতীয়ত ঃ এ পদ্ধতি হলো স্বামীর একক ইচ্ছায় তালাক; যেখানে স্বামীকে তার স্ত্রীর প্রদেয় মোহর পরিশোধ করতে হবে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদেয় উপহারও ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ স্ত্রীর একক ইচ্ছায় ডিভোর্স দেয়া। যদি তার বিয়ের চুক্তিতে তথা তার নিকাহনামায় এটি উল্লেখ থাকে, তবে এককভাবে স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারবে- এটাকে বলা হয় 'ইসমা'। আমি কখনোই কাউকে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার পদ্ধতি 'ইসমা' সম্পর্কে বলতে শুনিনি।

চতুর্থতঃ এ পদ্ধতিটি হলো, যদি স্বামী তার সাথে খারাপ আচরণ করে অথবা তাকে ন্যায্য অধিকার না দেয়, তখন তার 'কাজীর' কাছে যাওয়ার অধিকার আছে এবং সে বিয়ে বাতিল করার আবেদন জানাতে পারবে। একে বলে 'নিকাহ-ই-ফাসেদ'। তখন কাজী তার ইচ্ছানুযায়ী স্বামীকে তার পাওনা সম্পূর্ণ মোহর অথবা মোহরের অংশবিশেষ পরিশোধ করার জন্য বলবেন।

পঞ্চমতঃ হলো 'খোলা' তালাক। এক্ষেত্রে যদিও স্বামী সব দিক থেকে ভালো হয় এবং তার সম্পর্কে স্ত্রীর কোনো অভিযোগ না থাকে তথাপি তার ব্যক্তিগত কারণে স্বামীকে পছন্দ না হলে- তখন সে স্বামীকে অনুরোধ করতে পারে তাকে ডিভোর্স দেয়ার জন্য - আর এটাই হলো 'খোলা' তালাক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, নারী যে স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার এ পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করতে পারে সে কথা কেউ বলে না। কিছু আলিম আছেন যারা এ পাঁচ ধরনের ডিভোর্সকে ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করেন কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইসলামে তালাক পাঁচ প্রকার।

প্রশ্ন : ইসলামে নারীদেরকে কেনো মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি?

মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ নেই

উত্তর : যদি সংক্ষেপে বলতে হয় আপনার প্রশ্ন বেশ কঠিন। কুরআন এবং সহীহ হাদীসে এমন কোনো বক্তব্য নেই যার মাধ্যমে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে। কিছু লোক একটি নির্দিষ্ট হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন যে মুহাম্মদ (স) বলেছেন, 'মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে বাড়িতে নামায পড়া উত্তম এবং তার ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার ঘরের অভ্যন্তরের কক্ষে নামায পড়া 'তুলনামূলকভাবে উত্তম।' ঐসব লোকে অন্য সকল উৎস বাদ দিয়ে কেবল একটি উৎস গ্রহণ করেছেন।

রাসূল (স) বলেছেন– 'মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের কাজ।' তখন একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন হে নবী (স)! 'আমাদের শিশু বাচ্চা রয়েছে, আমাদের সাংসারিক কাজ করতে হয়, সুতরাং কীভাবে আমরা মসজিদে যাব?' তার উত্তরে নবী করীম (স) বললেন- যদি কোনো মহিলা ঘরে নামায পড়ে তবে মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে এটা তার জন্য উত্তম, ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার নিবিড় কক্ষে নামায পড়া আরো উত্তম।" যদি তার বাচ্চা থাকে অথবা তার কোনো সমস্যা থাকে তবে ঘরে নামায আদায় করলেও তার সমান সওয়াব হবে। একটি হাদীস হলো- 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা মহিলা তাদেরকে মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা দিও না।'

বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে মহিলাদের বাধা দেয় না। বলা হয়েছে- 'নবী করীম (সা) স্বামীদের আদেশ দিয়েছেন, যদি তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে চায়, তবে তাদেরকে বাধা দিও না।' এরকম আরো কিছু হাদীস আছে আমি এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাই না।

বস্তুত ইসলাম নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সেখানে তার জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে- আমরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নই। আমরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নই। কারণ, ইসলাম যদি মসজিদে এরকম করার সুযোগ দেয় তবে তাই ঘটবে যা সচরাচর অন্য ধর্মীয় স্থানে ঘটে– তবে পুরুষরা তাদেরকে 'ইভ টিজিং' ও

banglainternet.com

'কু-নজর' দেয়ার জন্য অধিক হারে মসজিদে আসবে; সালাত আদায়ের জন্য নয়। সুতরাং ইসলাম বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়। সেখানে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পর্যাপ্ত আলাদা আলাদা প্রবেশ দ্বার থাকতে হবে, আলাদা ওযুর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অন্যদিকে মহিলা এবং পুরুষদের আলাদাভাবে দাঁড়াতে হবে এবং মহিলাদের পুরুষদের পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে। কারণ যদি মহিলাদের পিছনে পুরুষরা দাঁড়ায় তবে সেখানে বাজে একটি পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের নামাযে মনোসংযোগের ঘাটতি হবে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই, আমাদের দাঁড়াতে হয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এক্ষেত্রে ডাক্তারগণ বলেন, মহিলাদের শরীরে তাপমাত্রা পুরুষদের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। সেক্ষেত্রে যদি আপনার পাশে কোনো মহিলা দাঁড়ায়, আপনি উষ্ণতা ও কোমলতা অনুভব করবেন। তখন আপনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার বদলে নারীটির প্রতি মনোনিবেশ করবেন। আর এজন্যই নারীদেরকে পুরুষদের সাথে না দাঁড়িয়ে তাদের পিছনে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

সৌদি আরবে গেলে আপনি দেখতে পাবেন মহিলারা মসজিদে নামায পড়ছে। আপনি যদি লন্ডন বা আমেরিকা যান, সেখানেও দেখবেন নারীরা মসজিদে যাচ্ছে। কেবল ভারত ও অন্য কতিপয় রাষ্ট্রে মহিলারা মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। আপনি যদি মক্কার মসজিদে হারামে বা মদিনার মসজিদে নববীতে যান সেখানেও দেখবেন মহিলারা মসজিদে আসছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, ভারতের কোনো কোনো মসজিদে এমনকি মুম্বাইয়েরও কিছু মসজিদে নারীদের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমি আশা করব এরকমভাবে অন্যান্য মসজিদেও এ ব্যবস্থা চালু হবে।

প্রশ্ন : স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কি প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে?

প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়া উত্তম

উত্তর : এটি স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় যে দ্বিতীয় বিয়ের সময় তার আগে থেকে অনুমতি নিতে হবে– কেননা কুরআন বলেছে–'তুমি একাধিক বিয়ে করতে পারবে একটা মাত্র শর্তে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীদের মধ্যে (পূর্ণাঙ্গভাবে) ন্যায়বিচার করতে পার।' কিন্তু এটি অবশ্যই উত্তম দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীর অনুমতি নেয়া এবং তাকে জানানো। কারণ ইসলাম বলে–'যদি তোমার একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তোমাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হবে।'

যদি প্রথম স্ত্রী অনুমতি দেয়, তবে স্বামী ও তার দুই স্ত্রীর মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় থাকবে। কিন্তু এটি আবশ্যকীয় নয়, তবে যদি বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ থাকে তবে তাকে অনুমতি নিয়েই বিয়ে করতে হবে। চুক্তিটি এরকম যে, 'তুমি স্ত্রী থাকাকালীন আমি কাউকে বিয়ে করব না।' কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয় বরং ভালো।

প্রশ্ন : ইসলাম যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়, তখন কীভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তারা একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতো?

যুদ্ধের প্রয়োজনে ছাড় দেয়া হয়েছে

উত্তর : আপনি যদি 'সহীহ বুখারী' পড়ে থাকেন, সেখানে বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের দেখা যাচ্ছিল, অথচ স্বাভাবিক সময় তাদের পা ঢাকা থাকতো। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের ঘোড়ায় চড়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে, তখন তাদের খালি পা দেখা যেতো। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে পর্দার ক্ষেত্রে; তবে তার মানে এ নয় যে, ইসলাম তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দিয়েছে- যেরকম দেখা যায় আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে। বরং তারা ইসলামি মূল্যবোধ ও ইসলামি পোশাক বজায় রেখে চলতো।

প্রশ্ন : ভিডিও ফিল্ম, নাচ-গান, উপন্যাস, ম্যাগাজিন ও সহ-শিক্ষা সংস্কৃতির কারণে বর্তমানে যৌন অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে- সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সন্তানদেরকে বিশেষত মেয়েদেরকে কি বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করার অধিকার তাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি?

বাধা নয় পরামর্শ দিতে পারবে

উত্তর : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বর্তমানে যৌনতার ওপর ভিত্তি করে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কি সন্তানদের বিশেষত মেয়েদের তাদের নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করার ওপর অনুমতি দেয়া যায়? জবাব হলো– পিতামাতা

banglainternet.com

নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে পরামর্শ দিতে পারে কোথায় বা কাকে তারা বিয়ে করবে, কিন্তু তারা বিয়ের ব্যাপারে কোনোরূপ বাধ্য করতে পারবে না। আপনি কি এটি বলতে পারেন পিতামাতার পছন্দ সর্বদা সঠিক হবে? সুতরাং ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিয়ের দিকনির্দেশনা দিতে পারবে, কিন্তু তারা কোনোরূপ বাধ্য করতে পারবে না কারণ এটি নিশ্চিত যে, অবশেষে স্বামীর সাথে তার কন্যাকেই থাকতে হবে; পিতা-মাতাকে নয়।

প্রশ্ন : 'মুসলিম আইন' অনুযায়ী কেবল পিতাই তার সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক–কিন্তু কেনো?

একমাত্র পিতাই অভিভাবক নন

উত্তর : ইসলাম কেবল পিতাকেই সন্তানের অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছে–এটি ভ্রান্ত কথা। ইসলামি শরিয়া মতে, সন্তানের জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ মোটামুটি ৭ বছর বয়েসে অথবা ৭ বছরের কম বয়সের সময় অভিভাবকত্ব মায়ের দিকেই থাকে। কারণ এ সময়ে মায়েরা সন্তানদের প্রতি পিতার চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল। তারপর অভিভাবকত্ব পিতার দিকেই চলে যায় এবং সন্তান উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তখন এটা নির্ভর করে তার ইচ্ছার ওপর সে কার কাছে থাকবে। সে পিতা বা মাতা যার কাছে ইচ্ছা থাকতে পারবে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তাকে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষা ও তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

সমাপ্ত

banglainternet.com